

# শীতলার বিবাহ-বাসর ও অন্যান্য প্রবন্ধ

ডক্টর তারাম্বিশ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা  
ইন্দুভূষণ অধিকারী

পূর্বাঙ্গি প্রকাশনী

---

পরিবেশক  
সুবর্ণরেখা  
৭৩, মহাশ্মা গান্ধী রোড,  
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর, ১৯৫৯

প্রকাশক

ইন্দুভূষণ অধিকারী

পূর্বাদি প্রকাশনী

ভগলুক

মুদ্রক

টি. টি. ষ্টেডাস

১৫এ, ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট

কলকাতা-১০

## উৎসর্গ

যাঁর সান্নিধ্যে এসে তারাশিস মন্থোপাধ্যায়ের মধ্যে  
চেতনার নূ-বিজ্ঞান উন্মেষ এবং দীপায়ন  
সেই নূতন্তরবিদ নির্মল কুমার বসুর  
স্মৃতির উদ্দেশে

## সূচীপত্র

কথামুখ	৫
সয়াল পূজার বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানের আলোচনা	
শীতলার বিবাহ-বাসর	৯
শীতলা মঙ্গলে চৌষটি বসন্ত	৯৫
ভমলুক মহকুমায় শীতলা	
পূজার বৈচিত্র্য	১৩৬

## কথামুখ

দেবী শীতলার কূলপঞ্জী নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। অনেকেই এংকে প্রাক্-আৰ্ষ ভারতে পূজিতা দেবী এবং পরবর্তী সময়ে তিনি আৰ্ষ দেবী হিসেবে গৃহীতা বলে মনে করেন। 'শীতলা মঙ্গল' গুলির কাহিনী সমূহের বিশ্লেষণে তাঁকে দেবী মনসার মত শিবের স্নেহধন্যা বলে বৃদ্ধিতে অসুবিধে হয় না। শিব যে প্রাগাৰ্ষ দেবতা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হরুপা-সংস্কৃতির কেন্দ্রে আবিষ্কৃত সীলমোহরগুলির মধ্যে আদি শিবের প্রতিকৃতি আমরা লক্ষ্য করেছি; শ্বাপদ পরিবৃত পশুপতি শিবকেও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই শিবের সঙ্গে শীতলার নিবিড় এবং হাদ্যসম্পর্ক এই দেবীর অনাৰ্ষ ঐতিহ্যেরই স্মারক হয়ত। আবার বিভিন্ন শীতলামঙ্গল পুঁথিতে শীতলার উৎপত্তির যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে তা সত্যিই কৌতূহলোদ্দীপক। যজ্ঞাগ্নি নির্বাচিত হওয়ার পর শীতলার আবির্ভাব সেই কুন্ড থেকে মাথায় সুর্প এবং হাতে সম্মার্জনী নিয়ে। আৰ্ষরা কি হোমাশিখা নির্বাচিত করে শীতলা-কে বরণ করেছিলেন অথবা হোমাগ্নি-র কার্যকারিতা নিঃশেষিত হওয়ার রক্ষ-পথে শীতলার অনুপ্রবেশ? স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য মনসার মত শীতলাকে ও যে জোর লড়াই করতে হয়েছিল, নানারকম ছলচাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়েছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এমন প্রশ্নও উঠেছে শীতলা বিদেশিনী। কারণ হিসেবে দেখান হয়েছে তাঁর বাহনটিকে নিয়ে। গর্দভ বাহন হিসেবে ভারতে অত্যন্ত নিশ্চিন্দনীয়। নিশ্চিন্দাযোগ্য কাজ করলেই কাউকে গর্দভের ওপর বসিয়ে লোকালয় থেকে বহুদূরে পাঠিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু মধ্য-প্রাচ্যে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে গর্দভের ওপর চড়ে যাতায়াত নিশ্চিন্দনীয় নয় মোটেই। মেরুী মাতা শিশু যীশুকে কোলে নিয়েই মিশরে চলে গিয়েছিলেন। যীশু পরবর্তীকালে যখন শিষ্যবর্গের সঙ্গে জেরুজালেমের মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন তখন তিনি গাধার পিঠে চড়েই গিয়েছিলেন। সুতরাং কোন গবেষণা

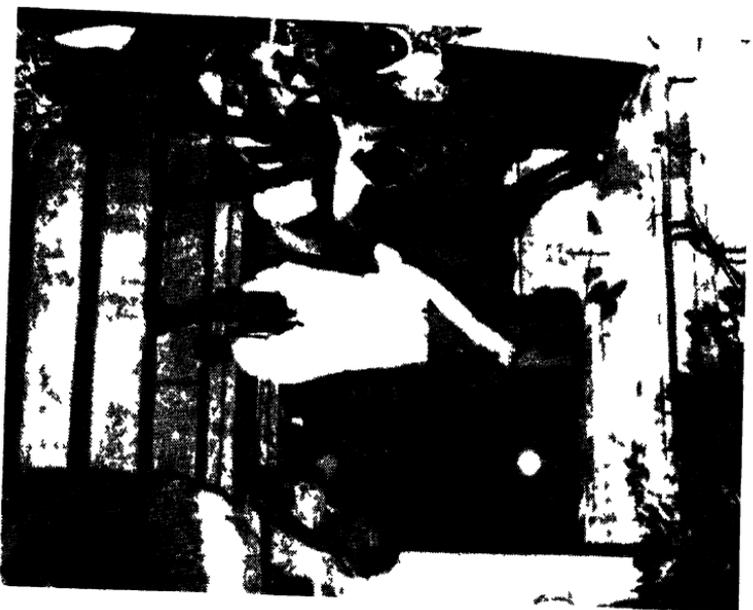




শিখাহ বেদীতে ঘণ্টাকর্ণ হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে ।  
মূল পুরোহিত বরণ করছেন ।



মূল গায়ের চামর হাতে গান করছেন ।



বৃষ্ণ পুরোহিত মন্দিরে শীতলাকে আরাতি করে, আরাতি করলে  
করতে সিংড়ি দিয়ে নেবে বিবাহ-বেদীর দিকে এগিয়ে আসছেন



গাউজার শাঁউ জল সংগ্রহ করছেন গ্রামবাসীরা



মূল গায়েরন ঝর্টা হাতে ( ঝর্টাঙ্গর্গ বেশে ) মন্দিরের দাকানে ঝর্সে



মূল গায়েরন শীতলা বেশে আসরে গান করছেন ।



মূল গায়নকে ঘণ্টাকর্ণ বেশে সাজানো হচ্ছে ।



বিবাহ বেদীতে ঘণ্টাকর্ণ দাঁড়িয়ে । গ্রামবাসীরা বসে আছেন ।

(ক) এই গ্রামের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত নয়দিন ব্যাপী সয়াল পূজা অনুষ্ঠানটি খুবই ব্যঙ্গসাপেক্ষ। তাই প্রতিবছর এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। সচরাচর সাত-আট বছর অন্তর এই অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে। নিয়ম হল—‘দেশপূজা’র সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে পর পর চারটি পূজার ব্যবস্থা করতে হয়। এগুলি হল—ঠেট্র মাসে শিবের গাজন, বৈশাখ মাসে দেবী শীতলার সয়াল। এরপর যে-কোন শুভদিনে মহাপ্রভু পূজা এবং অমানিশায় কালী পূজা।

প্রধানতঃ পূজা পরিচালনার প্রয়োজনে, গ্রামের মত্থ্যা বা প্রতিনিধির কাছে পূজার নিয়মাবলী ও হিসেবের খাতা থাকে। গ্রামের বিভিন্ন পরিবারের আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দেশপূজার চাঁদা নির্ধারণ করেন। চাঁদা ছাড়াও, গ্রাম বিচারের মাধ্যমে মাতব্বরেরা যে জরিমানা ও অন্যবিধ অর্থ আদায় করে থাকেন সেই আয় থেকেও পূজার ব্যয়ভার মেটানো হয়ে থাকে। শুনলাম, এবার যারা দেশপূজার অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন, তাঁদের অনেকেই কিন্তু নবাগত। বর্তমানে যিনি এই গ্রামের মত্থ্যা, তিনিও তাই। এর কারণ হল—পূর্বে যারা এই গ্রামের মাতব্বর ছিলেন, রাজনৈতিক পালা বদলের প্রেক্ষাপটে তাঁদের অনেকেই আজ ক্ষমতাচ্যুত। গ্রামের যুবক পরিচালকবর্গ তাঁদের পূর্বতন বয়স্ক সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করেই দেশপূজার অনুষ্ঠানগুলি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

(গ) সন্ন্যাসপূজা আরম্ভের কয়েকদিন পূর্বে শীতলা মঙ্গল, মনসামঙ্গল, বোদ ংটার গান, গোষ্ঠ পূজার গান, ওলাবিবির গান, হরি পূজার গান, বিয়ের গান ও অষ্টমঙ্গলা গানের প্রয়োজনে, কোন একটি পাঁচাল গানের দলের মূলগায়নকে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে পান-স্নপারি দিয়ে আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণ করে আসতে হয়। গ্রামের কলেকজন মাতব্বর ( পাঁজকা দেখে একটি শূভদিন নির্বাচন করে ) নিমন্ত্রণ করতে যান। এবার যিনি মূলগায়ন হিসেবে পান-স্নপারি গ্রহণ করেছেন, তাঁর নাম বাসুদেব চক্রবর্তী। তাঁনি বংশানুভাবে কৃষি কাজে নিযুক্ত মাহিষ্য জাতির কুল পুরোহিত গোড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। নিবাস—তমলুক থানার নিমতোড়ী গ্রামে। এবছর এই প্রথম তাঁনি এখানে গান গাইতে আসছেন। কারণ, ইতিপূর্বে যিনি এখানে বেশ কয়েকবার মূলগায়নের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন—বৃদ্ধ ও অশক্ত হওয়ার কারণেই, তিনি এবার পান-স্নপারি গ্রহণে আপত্তি করেছেন।

(ঘ) সন্ন্যাস পূজার পূর্বািন রাতে,—এঁরা ধূনা পুড়িয়ে ও বাজনা বাজিয়ে সমগ্র দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামটি প্রদক্ষিণ করেন। গ্রাম প্রদক্ষিণের প্রাক্কালে, এই গ্রামের ৩২২ ঘর প্রজার বাড়িতে মালা-চন্দন দেওয়ার মাধ্যমে, পূজার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। মালা-চন্দন দেওয়ার পূর্বে সেগন্দি বধারীতি দেবী শীতলার মন্দিরে নিবেদিত হয়ে থাকে। দেশাচারে এই মালা-চন্দন পাওয়ার পর থেকে নয় দিনব্যাপী সন্ন্যাস পূজার সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত, গ্রামের প্রত্যেকটি পরিবারেই—লাঙল করা, ধান সিক করা, কাপড় কাচা, চুল-দাড়ি কামানো, জবাই করা মাংস খাওয়া, বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন অথবা নববধূর প্রতিগৃহে যাত্রা ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলেই গণ্য হয়। বাস্তবে এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে, একটি গ্রামে বসবাসকারী একাধিক থাকবন্দী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতিফলন ধরা পড়ে।

(ঙ) 'গ্রাম-ষোল-আনা'র পক্ষ থেকে আয়োজিত দেবী শীতলার সন্ন্যাস পূজায় গোড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণই পুরোহিত্য করেন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ছাড়াও, সন্ন্যাস পূজার প্রয়োজনে—নািপত, মালাকার, মাহিষ্য, ক্যাওরা বৈষ্ণব ইত্যাদি বেশ কয়েকটি জাতি ও সম্প্রদায়ের লোকেরা নানাভাবে সহযোগিতা করে থাকেন। অবশ্য এজন্য তাঁদের প্রত্যেককেই সাধ্যমত পারিশ্রমিক দিতে হয়। তবে এই উপকরণ সমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় বাঁশের জিনিস, পোড়া-মাটির সামগ্রী,

আতশবাজি, বেনে-মসলা, কাপড়, গামছা, ফলমূল, মিষ্টি, বাতাসা ইত্যাদি হাট-বাজার থেকেই নগদ মূল্যে সংগৃহীত হয়।

(৫) দেবী শীতলার আনুষ্ঠানিক সন্মাল পূজার বিভিন্ন দিনে গোষ্ঠপূজা, হরিপূজা এবং ওলাবিবি পূজা হয়ে থাকে। এই সকল পূজার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল, পাঁচাল গানের দলের পক্ষ থেকে গোষ্ঠ, হরি এবং ওলাবিবির জন্য নির্দিষ্ট বন্দনা ও মঙ্গলগান। মূলগায়নের নির্দেশে, তাঁর দলের লোকেরাই সমবেতভাবে ঐ সকল গান করেন। পূজার নবম দিনে, অষ্টমঙ্গলা গানের মাধ্যমে সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

(৬) উল্লেখ্য যে, সন্মাল পূজার চতুর্থদিনে দেবী শীতলার সঙ্গে ঘণ্টাকর্ণ দেবের আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয়ে থাকে। এই বিবাহের প্রেক্ষাপটে, পাঁচাল গানের দলের মূলগায়নকেই ঘণ্টাকর্ণ দেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। বিবাহের পূর্বে ঘণ্টাকর্ণের রূপসজ্জায় মূলগায়নকে সমগ্র দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামটি পরিভ্রমণ করতে হয়। গ্রাম-পরিভ্রমণ শেষে উনি শীতলা মন্দিরের সন্মুখস্থ ছাঁদনাতলায় উপস্থিত হলে, দেবী শীতলার সঙ্গে তাঁর আনুষ্ঠানিক বিবাহের সূত্রপাত হয়। দেবী শীতলা কিন্তু ঐ সময় মন্দির কক্ষেই থাকেন। মন্দির কক্ষে থাকলেও, পূজক ব্রাহ্মণের সহযোগিতায় পাত্র-পাত্রীর মেলবন্ধন ঘটে।

উল্লেখ্য যে, দেবী শীতলার সঙ্গে পাঁচাল গানের দলের মূলগায়নের এই বিবাহের প্রেক্ষাপটে, গ্রামবাসীরা এমন একটি দলকে নির্বাচিত করেন— যেখানে মূলগায়নের অবশ্যই ব্রাহ্মণ। কারণ, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন বর্ণের মূলগায়নের সঙ্গে দেবীর বিবাহ সম্পূর্ণ অবৈধ বিবেচিত হয়। অপর পক্ষে, যেহেতু এই বিবাহের অনুষ্ঠানটি এই জেলার অন্য কোন গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় না—সেই কারণে, সচরাচর কোন মূলগায়ন এই গ্রামে গানের জন্য নিমন্ত্রণ পেলেও, দেবীর সঙ্গে বিবাহের প্রশ্নে সন্মোচনের সঙ্গেই এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনার সময় আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে, মেদিনীপুরের অপরপূর্ণ গ্রামে যখন দেবী শীতলার সন্মাল পূজার বিবাহের কোন প্রথা নেই, এমনকি পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও এমনতর বিবাহের কোন লিপিবদ্ধ দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না—সেখানে দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামে মানুষের সঙ্গে দেবীর বিবাহ অনুষ্ঠানটি প্রচলনের কারণ কী? আমাদের প্রশ্নের উত্তরে জনৈক গ্রামবাসী বললেন—

“সে একটা ইতিহাস। মরুভূমীদের মত্থে শুনোছি, আমাদের গ্রামের মা শীতলা নাকি এক সময় নিজেকে পুরোহিত ঠাকুরের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে কোন এক শাখারীর কাছে শাখা পরে, তাঁর বাপের কাছে শাখার মূল্য চেয়ে নিতে বলেছিলেন। তাই শাখারী যখন বামুন ঠাকুরের কাছে শাখার দাম চাইতে এলেন তখন তো তাঁর মাথায় হাত! বামুন ঠাকুর

মনে মনে ভাবলেন—ব্যাটা শাখারী ঠিক তাঁকে ঠকাতে এসেছে। কারণ, আবার গেয়ে কোথায়। এছাড়া, কেনই বা একটি মেয়ে তাঁর মেয়ে বলে মথ্যা পরিচয় দিয়ে শাখা পরতে যাবে? এসব ব্যাটা শাখারীর চালাকি ছাড়া আর কি? তাই বামুন ঠাকুর শাখায় মূল্য দিতে অস্বীকার করলেন।

যাইহোক, সাত-পাচ নানারকম ভাবতে-ভাবতে, বামুন ঠাকুর শীতলা মন্দিরে গেলেন নিত্য-পূজা করতে। মন্দিরের দরজা খুলে দেখেন—দেবীর হাতে নতুন শাখা। চোখ-মুখেও যেন আনন্দের স্পর্শ। দেখে উনি চমকে উঠলেন। সর্বাঙ্গ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ভাবলেন, তবে তো সেই শাখারী তাঁকে ঠকাতে আসেনি। তাছাড়া, যেহেতু দেবীর হাতে বেশ কিছুদিন কোন শাখা ছিল না—তাই শাখারীর সঙ্গে ছিলনা বরং উনি নিজেই শাখা পরে নিয়েছেন আমার মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে।

দেখতে-দেখতে এই কাহিনী ছাড়িয়ে পড়ল হাটে-বাজারে। পরে শাখারী সেই বস্ত্রান্ত শূনে ভাবলেন—তবে তো দেবী শীতলা তাঁর সঙ্গেও ছিলনা করেছেন; তিনি সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামে দেবী শীতলার মন্দিরে পূজা দিতে এলেন। বামুন ঠাকুরও সেই শাখারীকে দেখতে পেয়ে, হাঁতপূর্বে তাঁকে যে প্রভারক মনে করেছিলেন, সেজন্য তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। শূধু তাই নয়, যেহেতু মা শীতলা তাঁর অন্তঃকরণে বলে পরিচয় দিয়ে শাখা পরেছেন, তাই আগামী সন্ধ্যা পূজার সময় গ্রাম-ষোল-আনার মতামত নিয়ে ঘণ্টাবর্ণ দেবের সঙ্গে তাঁর কন্যা শীতলার বিবাহ দেবেন বলে মনস্থ করলেন। কারণ, মেয়েদের কাছে শাখা-সিঁদুরই তো সব থেকে বড় অহংকার। বক্ততে গেলে, সেই যে প্রায় আট পুরুষ আগে মায়ের বিয়ের পস্তুন হয়েছিল আজও সেই অনুষ্ঠানটি একইভাবে পালিত হচ্ছে।”

(জ) এই গ্রামের শীতলা মন্দিরে প্রত্যহ দুপুরে আমিষ ভোগ নিবেদনের প্রথা আছে। তবে সন্ধ্যা পূজা উপলক্ষে, রাত্রেও তাঁকে আমিষ ভোগ দেওয়া চলে। ঐ দিনগুলিতে কিন্তু দুপুরে ভোগ দেওয়া হয় না। উল্লেখ্য যে, দেবীর কাছে আমিষ ভোগ নিবেদনের প্রথা থাকলেও, আজও কিন্তু পশুবলি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অবশ্য তমলুক ও মহিষাদল থানার বেশ কয়েকটি শীতলা মন্দিরে প্রথানুগ ছাগ বলির দৃষ্টান্ত যে নেই, তা নয়।

সে যাইহোক গ্রামবাসীদের অভিমতে—এই গ্রামের দেবী শীতলার স্মৃতিস্তম্ভের জন্যে মধ্যাহ্নের পূর্বে নিত্য পূজাসহ আমিষ অন্নভোগ এবং রাত্রে শয়নের পূর্বে ফল-মিষ্টি দেওয়ার ব্যয়ভার মেটানোর প্রয়োজনে, গ্রাম-ষোল-আনার পক্ষ থেকে মন্দিরের পূর্ব-তন সৈবাহিত-ব্রাহ্মণদের বেশ কিছুটা সম্পত্তি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণদের দুর্ভব্ব্য কারণে, বর্তমানে সেই সম্পত্তির অনেকটাই কিন্তু বিক্রি হয়ে গেছে। তথাপি, এই দুর্ভব্ব্যের দিনেও, ব্রাহ্মণেরা তাঁদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেছেন।

(ক) সন্ধ্যা পূজার বিভিন্ন দিনে, এই গ্রামের অনেকেই শীতলা মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। এছাড়া, পারিবারিক কোন মাজলিক অনুষ্ঠান অথবা বিশেষ কোন মানসিক পূরণের কারণেও, দেবী শীতলাকে তাঁরা তাঁদের পরিবারে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই সকল ক্ষেত্রে মন্দিরের সেবাইত-ব্রাহ্মণদের কাছেই প্রধানতঃ আমন্ত্রণ জানাতে হয়। এই আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে, পূর্ব-নির্দিষ্ট দিনে পুরোহিত মশাই দেবী শীতলার সুসজ্জিত পিতলের মূর্তিটিকে কাঠের সিংহাসনে স্থাপন করে, সেই পরিবারে নিমন্ত্রণ রক্ষার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ঐ সময় দেবীর সম্মুখে একজন জলছড়া দিয়ে চলেন। ঢাক-কাঁসর বাদকেরা থাকেন ঠুঁদের সামনে। মানত অনুসারে কোন কোন ক্ষেত্রে গোড়া ঢাক অথবা অন্যান্য বাজনাও থাকতে পারে। যথাস্থানে উপস্থিত হওয়ার কিছু পরেই দেবীর আনুষ্ঠানিক পূজা ও আম্রভোগ নিবেদনের ব্যবস্থা হয়। পূজা ও ভোগ নিবেদনের শেষে, একই নিয়মে শীতলা দেবীকে নিয়ে মন্দিরে ফেরা হয়।

এই দৃষ্টান্তের পাণাপাশি দেবীর অনুগ্রহে কোন মনস্কামনা সিদ্ধ হলে, দক্ষিণ নারকেলদার গ্রামের বাসিন্দারা ছাড়াও, মাঝে-মাঝে গ্রামান্তর থেকেও সেবাইত ব্রাহ্মণদের কাছে চাল, ডাল, তেল, আনাজ, মসলা ও পোনা মাছ পাঠানো হয়। ভোগ নিবেদনের শেষে, ভক্তেরা সেই 'প্রসাদ' নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। তবে, যেহেতু সেবাইত পরিবারের লোকেরাই ভোগ রান্না করেন—সেই কারণে অন্নভোগের কিছুটা অংশ তাঁরাও পেয়ে থাকেন। যাইহোক, যদিও এই অন্নভোগ দেওয়ার নিয়মগুলির সঙ্গে দেবীর সন্ধ্যা পূজার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই, তথাপি এই সকল দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পরোক্ষ দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামের দেবী শীতলার উল্লেখ্য আঞ্চলিক প্রভাবেরই ইঙ্গিত মেলে।

### পূজার প্রথম দিন

উদযোক্তাদের সঙ্গে আলোচনার শেষে, সন্ধ্যার কিছুটা পরে আমরা শীতলা মন্দিরে উপস্থিত হলাম। পেট্রোম্যান্ডার আলোর সামনে ওখানে একদল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আনন্দে হইচই করছে। মন্দির প্রকোষ্ঠে উঁকি মেয়ে দেখলাম, তখনও পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ হয়নি। দুজন সেবাইত ব্রাহ্মণ দেবী শীতলার পিতলের মূর্তিটিকে তাঁর সিংহাসন থেকে নামিয়ে পরিষ্কার করছেন। একটু পরে ঠুঁদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জানলাম—ঠুঁদের একজনের নাম হিমাংশু শেখর করশর্মা এবং অপর জন হলেন চণ্ডীচরণ মিশ্র। বংশানুক্রমে, চণ্ডীচরণ মিশ্রের পরিবার দেবী শীতলার পূজায় পুরোহিত্য করে আসছেন। পরবর্তীকালে হিমাংশুবাবুর পূর্বপুরুষেরা, গ্রাম-ষোল-আনার সম্মতিক্রমে এই পূজার

দায়িত্ব পেয়েছেন। এর ফলে, এখন প্রত্যেক মাসে উভয় তরফের পনরেচ দিন করে 'পালা' পড়ে।

আমাদের সঙ্গে আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে, ওঁরা দৃষ্টিতে মিলে দেবীকেন নতুন শাড়ি ও অলংকারে সাজিয়ে—নতুন একটি কাঠের সিংহাসনের উপর স্থাপন করলেন। শুনলাম, পুরাতন সিংহাসনের পরিবর্তে, এবার এই নতুন সিংহাসনটি তৈরী করানো হয়েছে। যাই হোক, নতুন সিংহাসনের উপর দেবীর সদৃশ সজ্জিত মূর্তিটি স্থাপনের পরে—হিমাংশুদেব ও ঐ সিংহাসনটির সামনে ঘণ্টাকর্ণ দেবের ঘট স্থাপনের জন্য পঞ্চগড়ি দিয়ে 'ভদ্রমণ্ডল' অঁকা শূন্য করলেন। এই কাজের শেষে, ঐ ভদ্রমণ্ডলে কিছুটা পূর্বদিকে, দেবী শীতলার ঘট স্থাপনের জন্য সর্বতো ভদ্রমণ্ডল অঁকতে বসলেন। এর পরে ব্রহ্মার পূর্ণপাঠ স্থাপনের জন্য সর্বতো ভদ্রমণ্ডলের কিছুটা পূর্বদিকে, আতপ চালের গড়ি দিয়ে 'অষ্টদল পদ্ম' অঁকন করলেন। নিয়ম হল—এই ঘটগুলি শীতলা মূর্তির সম্মুখে পূর্ব-পশ্চিমে পাশাপাশি বসানো হবে। যাই হোক, পূর্ণোক্ত অঁকনের কাজ শেষ হলে, হিমাংশুদেব ঘণ্টাকর্ণ ও শীতলার ঘটের সামান্য দক্ষিণে, আতপ চালের গড়ি দিয়ে অষ্টদল পদ্ম অঁকে—তার উপর দর্পণ সহ একটি পাঠ স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন। উল্লেখ্য যে, হিমাংশুদেব যখন ঐ সকল মণ্ডল অঁকনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তখন চণ্ডীবাবু তাকে নানাভাবে সহায়তা করছিলেন। চণ্ডীবাবুর মতে শুনলাম—ইতিমধ্যে শীতলা, ঘণ্টাকর্ণ, ব্রহ্মার পূর্ণপাঠ এবং দর্পণযুক্ত পাঠের গায়ে পিটুলি ও সন্ধ্যাবিধি মাখানোর কাজ শেষ হয়েছে। এখন কেবল সিঁদুর দিয়ে ঘণ্টাকর্ণের ঘটে পুতুল, শীতলার ঘটে দেবীমুখ এবং ব্রহ্মার পূর্ণপাঠ ও দর্পণ স্থাপনের জন্য পাঠের গায়ে অক্ষচ্ন্দ্র অঁকতে হবে। এছাড়া, আরো নাকি অনেক কাজ বাকি আছে।

ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কিছুটা আলাপ করে, আমরা মন্দিরের দালানে এসে দাঁড়লাম। ওখানে তখন সুরেশ্বরনাথ বেরা, সুরেশ্বরনাথ মাল ও রতন চন্দ্র জানা পাঠের বিড়া তৈরীতে ব্যস্ত। ওঁদের মতে শুনলাম—সকাল পূজার বিভিন্ন দিনে ঘট ও উপঘট স্থাপনের জন্য এই বিড়াগুলির প্রয়োজন হবে।

আমাদের ওখানে দেখে, শচীনন্দন ভৌমিক এগিয়ে এলেন। কথা প্রসঙ্গে উনি জানালেন যে, গ্রাম-ষোল-আনার পক্ষ থেকে এবার ওঁকে 'ব্রতী' হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই কারণে, গতকাল উনি নিরামিষ আহার করেছেন। আজ সকাল থেকে উপোস করে আছেন। রাতে পূজার কাজ না মিললে, জলস্পর্শ করতে পারবেন না। উনি ছাড়াও, এই পূজায় যিনি 'ভাড়ারী' নিযুক্ত হয়েছেন, তাকেও উপোস করতে হয়েছে। ভাড়ারীর নাম চণ্ডীচরণ আদক। ভাড়ার ঘর থেকে পূজার যাবতীয় উপকরণ সরবরাহের দায়িত্ব চণ্ডীবাবুর।

শচীনন্দনবাবুর সঙ্গে আলোচনার শেষ ভাগে, চণ্ডীবাবু আমাদের

কাছে এলেন। প্রাথমিক পরিচয়ের পরে আমাদের অবগতির জন্যে উনি বললেন :

“দেখুন, পূজা আরম্ভের খুব একটা বিলম্ব নেই। আজ রাত ৮টা ৫৫ মিনিটের পর থেকে ১০টার মধ্যে মায়ের ঘট উঠবে। বলতে গেলে, সেই সকাল থেকেই আমাকে নানাভাবে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। পূজার জিনিসপত্র যোগাড় করাই তো এক সমস্যা। আমাদের গ্রামে আবার মালাকার নেই। তাই ভিন্ন গ্রামের মালাকারের কাছ থেকে শোলার জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হয়। উনি ইতিমধ্যে সেসব জিনিস দিয়ে গেছেন। এই পূজার মধ্যে অবশ্য ঠুকে আবার আসতে হবে। সে যাইহোক, মালাকারের অনর্পাশ্চিত্তির কারণে—মায়ের পূজার ফুল, দূর্বা বেলপাতা ইত্যাদি যোগানোর দায়িত্ব এই গ্রামের নাপিতদের। ঠুদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ মান্না ছাড়া আরও কয়েকজন আছেন। এবার বলি, আমাদের গ্রামে আবার ঢাকী নেই। তাই পাশের গ্রাম বাড় বিহিচ বেড়্যা থেকে ঝাঁকে আনতে হয়। তাঁর নাম নারায়ণ চন্দ্র ঘোড়াই। ঢাকের সঙ্গে কাঁসর সঙ্গতের প্রয়োজনে ঠুর সঙ্গে একটি ছোট ছেলে আসে। ঠুরা জ্ঞাতিতে ক্যাওরা। সচরাচর নারকেল গাছ ছাড়ানোই ঠুদের পেশা। সবকিছু বলতে গেলে, অনেক সময় লেগে যাবে। আপনারা তো পূজার কয়েকটা দিন এখানে থাকছেন। তাই নিজেরাই সবকিছু দেখতে পাবেন। কোন কিছু বৃথাতে অসুবিধা হলে, আমাদের সাধ্যমত আপনাদের বৃথিয়ে বলবার চেষ্টা করব। এসব নিয়ে এখন থেকে অযথা চিন্তা করবেন না।”

চণ্ডীবাণুর বক্তব্যের শেষে, শচীনন্দনবাবুর কাছে দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামের বর্তমান প্রতিনিধিদের নাম জানতে চাইলে, তিনি যে নয়জনের নাম বলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ প্রধান মূখ্য প্রতিনিধি। অপরপর প্রতিনিধিরা হলেন শ্যামাপদ ভৌমিক, দেবেন্দ্রনাথ হাজরা, নরেন্দ্রনাথ বেরা, সুরেন্দ্রনাথ বেরা, সুরেন্দ্রনাথ মাল, ইন্দুভূষণ বায়েন, শ্যামচাঁদ প্রধান এবং ভোলানাথ পট্টনায়ক।

আমাদের এই আলোচনার সময়, খোল-করতাল নিয়ে একাধিক লোককে মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হতে দেখলাম। আমরা মন্দিরের দালান থেকে নেমে, ঠুদের কাছে গেলাম। কথাপ্রসঙ্গে ঠুদের একজন জানালেন যে, দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামে চারটি বড় পাড়া আছে। এই কারণে, কালক্রমে প্রত্যেক পাড়াতেই কীর্তনের দল গড়ে উঠেছে। তবে, যেহেতু এই সন্ন্যাস পূজা গ্রাম-ষোল-আনার ব্যাপার—তাই এই পূজার সময় প্রত্যেক পাড়া থেকেই বাছাই করা গায়ক ও বাদক নিয়ে, একত্রে মায়ের কাছে কীর্তন গাওয়া হয়। এটাই এঁদের গ্রামের নিয়ম। শূধু তাই নয়, সন্ন্যাস পূজার শূধু থেকে অষ্ট-মঙ্গলার পূর্বদিন পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায়, আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস গান আরম্ভের পূর্বে, গ্রামের কীর্তনদলের লোকেরাই প্রথমে আসরে গান করে থাকেন।

হীতমধ্যে শীতলা মন্দির-সংলগ্ন জমির উপর বাশ-খড় দিয়ে তৈরী নতুন চালার নীচে মাটির চৌকো বেদীর উপর চট ও খেজুর চাটাই বিছিয়ে যে আসর পাতা হয়েছে—একটু পরে ওখানেই কীত'ন গাওয়া হবে। আজ ঠুঁদের দলে যারা এসেছেন তারা হলেন :—

হরিপদ মেটা...মূল গায়ন  
 বাসুদেব প্রধান...দোহার  
 অংশুমান ভৌমিক...দোহার  
 চণ্ডীচরণ মূলা...শ্রীখোল বাদক  
 হরিপদ জানা...শ্রীখোল বাদক  
 বংশীবদন মূলা...শ্রীখোল বাদক  
 নারায়ণ চন্দ্র ঝাঁপ...শ্রীখোল বাদক  
 নারায়ণ চন্দ্র জানা...করতাল বাদক  
 অনন্ত মার্জি...করতাল বাদক  
 বিষ্ণুপদ প্রধান...করতাল বাদক  
 সুদর্শন মূলা...করতাল বাদক  
 শচীন্দ্রনাথ মার্জি...হারমোনিয়ম বাদক

### ঘট ডোবানোর প্রস্তুতি

রাত দশটার মধ্যেই গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তির একে একে মন্দির প্রসঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন। মন্দির কক্ষে ব্রাহ্মণদের কাজও তখন শেষ। ঐ সময় গ্রামের মূখ্য প্রতিনিধি বীরেশ্বরনাথ প্রধানকে ব্রাহ্মণেরা জানালেন যে, গ্রাম-ষোল-আনার পক্ষ থেকে অনুমতি পেলেই তারা শীতলা ও ঘটাকর্ণের ঘট নিয়ে শীতলার পুকুরে ঘট-ডোবাতে যাবেন। ব্রাহ্মণদের অভিমত জেনে বীরেশ্বরনাথ ঠুঁদের বললেন—

‘দেখুন, যেহেতু এখনও অনেক প্রজা মন্দির প্রসঙ্গে উপস্থিত হতে পারেননি, তাই আমাদের আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতেই হবে। হীতমধ্যে যারা এসেছেন, তারা তো কীত'নের আসরে গান শুনছেন। মায়ের আনন্দ বিধানের কারণেই তো এই উৎসব, এই কীত'ন। তাই ঘট-ডোবানোর যখন কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে, সেই সময়টা কীত'ন গান চলুক’।

ঘট-ডোবানোর বিলম্ব দেখে, আমরা কীত'নের আসরে গেলাম। সমগ্র আসরটি তখন লোকে-লোকারণ্য। খোল, করতাল ও হারমোনিয়ম সহকারে কীত'ন দলেব লোকেরা ভক্তিভরে গান করে চলেছেন। মূল গায়ন বসেছেন উত্তর মুখে। এই সময় জটৈক গ্রামবাসীর কাছে মূল গায়নের উত্তর মুখে বসে গান করবার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে, তিনি বললেন—

‘বুঝলেন না, আমাদের গ্রামে মায়ের মন্দিরটি যেহেতু দক্ষিণ মুখী—সেই কারণে, মূল গায়ন শীতলা মন্দিরের দিকে তাকিয়ে, মাঝে মাঝে গান শোনানো উত্তর মুখে। অবশ্য ঠুঁর দলের লোকেরা নিজেদের সর্বাধিকার অন্য দিকে

মুখ করে বসলেও, মূল গায়নের ক্ষেত্রে উত্তর মুখে বসে গান করাই নিয়ম।  
বাহ্যগত সয়াল গানের দলের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না।”

### সয়াল পূজার অনুমতি প্রার্থনা

কীর্তনের আসরে কিছুরূপ কাটিয়ে, আমরা শীতলা মন্দিরের সামনে গেলাম। ওখানে তখন গ্রামের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, দুটি সারিতে পূর্ব-পশ্চিমে মুখোমুখি ভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ঠুঁদের মধ্যে মুখ্য প্রতিনিধি বীরেনবাবুকেও দেখতে পেলাম। কথা প্রসঙ্গে উনি আমাদের জানালেন যে, গ্রাম-ষোল-আনার পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত এই পূজা আরম্ভের পূর্বে—গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে ঠুঁকে প্রধানদুগ অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে। এই জন্যই এঁরা এখানে অপেক্ষা করছেন।

আমাদের সঙ্গে কথা শেষ করে বীরেনবাবু কীর্তন গান বন্ধ রাখবার অনুরোধ জানিয়ে কীর্তনের আসরে উপস্থিত গ্রামবাসীদের শীতলা মন্দিরের সামনে সমবেত হতে বললেন।

একটু পরে, শীতলা মন্দিরের সামনে সমবেত গ্রামবাসী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বীরেনবাবু যে বক্তব্য রাখলেন, তা এইরূপ—

“...দেশবাসী সবাই উপস্থিত আছেন—আর আমাদের প্রতিনিধিবর্গও প্রায় সবাই উপস্থিত আছেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে যে দুজন উপস্থিত আছেন—আমি সকল দেশবাসীর কাছে, প্রতিনিধিবর্গের কাছে এবং বিশেষ অতিথিদের কাছে আজ মায়ের নামে যে ঘট উস্তোলন হবে, তার জন্য সবাইয়ের কাছে একটু অনুমতি চাচ্ছি। সবাই একটু সম্মতি, অনুমতি দিন—মায়ের ঘট উস্তোলন করি”।

বীরেনবাবুর এই আবেদনের সমর্থনে অপর একজন প্রতিনিধি বললেন—

“আপনি শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাই আপনি ব্রাহ্মণের কাছে অনুমতি নেওয়া, আপনি ঘট উস্তোলন করুন”।

এই সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে, মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত গ্রামবাসীরা ‘গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বোলা, হরিবোল’ ধ্বনি দিয়ে তাঁদের ‘ষোল-আনা’র সম্মতি ও আনন্দ প্রকাশ করলেন। এরপর ঠুঁদের মধ্যে অনেকেই গলবস্ত্র হয়ে হাটু-মুড়ে বসে, ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের ঘড়িতে তখন রাত ১০টা ২০ মিনিট। এভাবে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে সম্মতি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খোল, করতাল ও হারমোনিয়মের শব্দে সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণটি উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।

অনুমতি নেওয়ার অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হওয়ার একটু পরেই, কিভাবে মায়ের ঘট উস্তোলন শুরুর হবে, তা নিয়ে বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে কয়েকজন গ্রামবাসীর বাদানুবাদ কানে এল। তাই বীরেনবাবু ঠুঁদের বৃষ্টিয়ে বললেন—

“আরে, কথা বেশী বোলোনা বাবা—কথা বেশী বোলোনা। ধীর স্থির

হয়ে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাও, যেন সন্দেহভাবে আমাদের এই কাষটি সন্দেহপন্ন হয়।”

দেখলাম, বীরেনবাবুর কথা শুনে অনেকেই শান্ত হলেন। তথাপি, ঠুঁদের মধ্য থেকে জনৈক প্রতিনিধি কিছুটা বিরক্তির সঙ্গে বীরেনবাবুর কাছে জানতে চাইলেন ইতিমধ্যে সন্ন্যাস গানের দলের মূলগায়ন মন্দিরে চামর পাঠিয়েছেন কিনা বা কোন সংবাদ দিয়েছেন কিনা? মনে হল, তাঁর ধারণায়—ইতিমধ্যে মূলগায়ন ওখানে উপস্থিত না হওয়ার জন্যই হয়তো ঘট উত্তোলনের কাজে অস্বাভাবিক হলে। মন দিয়ে ঠুঁর বক্তব্য শুনে বীরেনবাবু তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন—

“না-না, অনেক আগেই তিনি ‘চামর’ নিয়ে মন্দিরে এসে—চামর রেখে গেছেন। হয়তো একটু বাইরে কোথাও গেছেন। এখনই এসে যাবেন। তাই এ-নিম্নে আপনাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। ওদিকে মন্দিরে ঘট-উত্তোলনে যাত্রার আয়োজনও প্রায় সম্পূর্ণ।”

এঁদের এই আলোচনার কিছুক্ষণ পরেই, দূর থেকে মূলগায়নকে আসতে দেখে অনেকেই যেন চিন্তাগুরু হলেন। ওখানে উপস্থিত হয়ে তিনি প্রথমে মন্দিরের দালানে গিয়ে ভক্তিরে দেবী শীতলাকে প্রণাম করে মন্দির প্রাঙ্গণে বীরেনবাবু ও অপরাপর গ্রামবাসীদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ওখানেই বীরেনবাবুর মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে ঠুঁর পরিচয় হল। জানলাম, ঠুঁর নাম বাসুদেব চক্রবর্তী। নিবাস—দক্ষিণ নারকেলদার নিকটবর্তী নিমতোড়ী গ্রামে। জাতিতে গোড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। প্রথম পরিচয়ের পরে কথায়-কথায় উনি বললেন—

“ইতিপূর্বে আমি দক্ষিণনারকেলদা গ্রামে গান করতে আসিনি। তাছাড়া, এই গ্রামের সন্ন্যাস পুঞ্জের শীতলা মায়ের সঙ্গে মূলগায়নের যে বিয়ের প্রথা আছে, সে সম্পর্কেও আমার কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই। আপনাদের পাঁচ-জনের আশীর্বাদে আশে-পাশের অনেক গ্রামে গান করতে গেছি—কিন্তু আগে কোথাও মায়ের বিয়ের কথা শুনিনি। তবু মায়ের ইচ্ছাতেই এখন এখানে এসেছি, তখন আমার সাধ্যমত সবকিছু নিয়ম মেনে কাজ করতে চেষ্টা করব। মায়ের কৃপাতেই সবকিছু সন্দেহপন্ন হবে।”

আমাদের এই আলোচনার সময় কীর্তন গানের আসর থেকে যে কথাদুলি ভেসে আসছিল, তা এইরূপ—

“ও-প্রাণ গৌর হে,  
গৌর হে, গৌর হে।  
ও-প্রাণ গৌর হে,  
গৌর হে, গৌর হে।”

এর কিছু পরেই তাঁরা সমবেত ভাবে “গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল—  
হরিবোল” বলে হরিধ্বনি দেওয়ার পরে, দলের মূলগায়ন পুনরায় গান ধরলেন—

“বলি একবার এসো, এসো

ও-প্রাণের—ও প্রাণের গোরা ।

একবার এসো, এসো

প্রাণের গোরা... ।”

ঔর গানের সঙ্গে ‘দোহারগণ’ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে লাগলেন ।

### ঘট উত্তোলন

ঘট উত্তোলনে যাত্রার পূর্বে, শীতলা মন্দিরের সামনে অনেককেই সমবেত হতে দেখলাম । ঐ সময় গ্রামের বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের দুটি সারিতে পূর্ব-পশ্চিমে মুখোমুখি দাঁড়ানোর জন্য বীরেনবাবু অনুরোধ জানালেন । এরপর, কিছুটা চিন্তা করে ঠেকে বলতে শুনলাম—

“আপনারা লাইনে দাঁড়ান । দুটো লাইন করে দাঁড়ান । আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, তা হল—আমাদের এই দুজন বিশিষ্ট অতিথি, আমাদের পূর্বে যিনি এই গ্রামের প্রধান ছিলেন তাঁর কাছে ও আমাদের দেশবর্গের সবাইয়ের কাছে অনুমতি নিয়ে এসেছেন । তাই আমাদের পক্ষ-তরফ থেকে তাঁদের অনুমতি দিব । তাঁরাও আমাদের সঙ্গে ‘ঘট-তুলতে’ যাবেন । সব তথ্য নেবেন । ঔরা এখন আমাদের একটা ফটো নেবেন । তাই আপনারা দয়া করে একটু লাইনে এসে দাঁড়ান ।”

দেখলাম, বীরেনবাবুর আহ্বানে ওখানে উপস্থিত সকলেই করজোড়ে সারিবদ্ধভাবে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেলেন । ঠিক এইসময় ঘট উত্তোলনে যাত্রার ইঙ্গিত দিয়ে ঢাকী নারায়ণ চন্দ্র ঘোড়াই ঢাকে কাঠি দিলেন । ঢাকের শব্দ শুনে, পূজার রত্নী শচীনন্দন ভৌগিক তাঁর বামহাতে বরণের উপকরণ সহ একটি থালা এবং ডানহাতে একটি পিতলের ঘট নিয়ে মন্দির থেকে নেমে এসে ওখানে দণ্ডায়মান প্রতিনিধি ও গ্রামবাসীদের মধ্য দিয়ে শীতলার পুকুরের দিকে এগিয়ে গেলেন । ঔর পেছনে ঘণ্টাকর্ণের ঘট হাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন হিমাংশু শেখর করশর্মা এবং তাঁর পেছনে শীতলার ঘট হাতে চণ্ডীচরণ মিশ্র । হিমাংশুবাবুর বামহাতের উপর যে নতুন মাটির ঘর্টাট ডানহাতে ধরা ছিল—সেই ঘর্টের গায়ে সিঁদুর দিয়ে আঁকা একটি পুতুল এবং সেই পুতুলের নীচে অঙ্কবৃত্তাকারে সিঁদুর দিয়ে আঁকা একটি বন্ধনী চোখে পড়ল । দেখলাম, এই ঘর্টাটির গলায় অক্ষসূত্র বাঁধা । ঘর্টের মুখে পঞ্চপল্লবের উপর ভাঁজ করে রাখা একটি নতুন গামছা ও সেইসঙ্গে ঘর্টের উপর একটি ‘কাঁড়োল’ মালা ।

অপরপক্ষে, চণ্ডীবাবুর বামহাতের উপর যে নতুন মাটির ঘর্টাট ডানহাতে ধরা ছিল—সেই ঘর্টের গায়েও তেল-সিঁদুর দিয়ে আঁকা একটি দেবীমুখ এবং সেই মুখের নীচে অঙ্কবৃত্তাকারে একটি বন্ধনী । ঘর্টের গলায় অক্ষসূত্র ও কাঁড়োল মালা । ঘর্টের মুখে পঞ্চপল্লব এবং তার উপরে ভাঁজ করে রাখা একটি নতুন গামছা । কালো চামর হাতে সয়াল

গানের দলের মূলগায়নে বাসুদেব চক্রবর্তী ছিলেন চণ্ডীবাবুর পেছনে। এই শোভাযাত্রার শেষভাগে গ্রামবাসীরা যখন বাদ্য সহকারে পুকুর ঘাট অভিমুখে যাত্রা করলেন, আমরাও তখন ঠুঁদের সঙ্গী ছিলাম।

একটু পরেই পুকুর ঘাটে গিয়ে দেখলাম যে, ঘট উত্তোলনের প্রয়োজনে শীতলার পুকুরের পূর্ব পাড়ে একটি চৌকো মাটির বেদী তৈরী করা হয়েছে। এই বেদীর প্রত্যেকটি কোণে একটি করে কলাগাছ, বাঁশের কণ্ঠ ও নারকেল পাতার সামনের অংশ প্রথমে মাটিতে পুঁতে, পরে তাদের অগ্রভাগ ঐ বেদীর উপর এমনভাবে গুঁছিয়ে বাঁধা হয়েছে—যার ফলে সমগ্র কাঠামোটি যেন একটি মন্দিরের আকার ধারণ করেছে। পুকুর পাড়ে পেণীছে—ব্রাহ্মণরা তাঁদের নিজ নিজ ঘটের গায়ে অঙ্কিত প্রতীক চিহ্নগুলিকে সামনে রেখে, উত্তরমুখে পূর্ব-পশ্চিমে পাশাপাশি রাখছেন। ইতিমধ্যে কীর্তন দলের লোকেরা পুকুর পাড়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গান আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মূখ্য প্রতিনিধি ও তাঁর সহকারীরা সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনার ক্ষেত্রে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে লাগলেন। ধূপ-ধূনার সঙ্গকে সঙ্গকে এই উৎসব-মুখর পরিবেশে ঢাক, কাসির, ঘণ্টা ও শেখর মিলিত যোগফলে—আবাল-বৃদ্ধ-বিনীতা সকলকেই পরিভ্রমণ মনে হল।

পুকুর ঘাটে পূজার আয়োজন সম্পূর্ণ হলে, রাত ১০টা ৩৭ মিনিটের সময় পূজক হিমাংশু শেখর করশর্মা ওখানে পূজায় বসলেন। ঠুঁর সামনে দুটি ঘট ও প্রয়োজনীয় পূজার উপকরণসহ 'বরণ থালা' চোখে পড়ল। পূজা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের দক্ষিণ পাড় থেকে আতশবাজি পোড়ানো শুরুর হওয়ার ফলে, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের মধ্যে চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল।

পূজার সূচনায় পুকুর পাড় থেকে নরম মাটি সংগ্রহ করে, হিমাংশুবাবু ঐ মাটি দিয়ে ছোট ছোট দুটি স্তূপ তৈরী করলেন। পরে ঐ প্রতীক স্তূপ দুটিকে বেদীর উপর পূর্ব-পশ্চিমে পাশাপাশি রেখে—গোটা পান, হরীতকী ও সিঁদুর দিয়ে সাজিয়ে গঙ্গা পূজার কাজ শুরুর করলেন। ঠুঁর কাজের ফাঁকে গঙ্গা পূজার তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে চাইলে হিমাংশুবাবু বললেন—

“দেখুন, এখন আমার কথা বলার সময় নেই। শূন্য এটুকু জেনে রাখুন যে, দেশাচাবে এটা সার্জাসিক গঙ্গা পূজা হলেও, বাস্তবে এটা কিন্তু পূরুষ-প্রকৃতিরই পূজা। তাই যে কোন শূন্য কাজের সূচনায় গঙ্গা পূজা বিধেয়। শূন্য তাই নয়, যেহেতু এখানে দেবী শীতলার সন্ন্যাস উপলক্ষ্যে তাঁর বিবাহের প্রথা আছে, সেই কারণে গঙ্গা পূজার তাৎপর্য সম্পর্কে কোন প্রশ্নই তো উঠতে পারে না।”

আমাদের সঙ্গে আলোচনার শেষে হিমাংশুবাবু যখন গঙ্গাপূজায় ব্যস্ত, তবুই সময় গ্রাম তরফের নির্বাচিত ব্রতী শচীনন্দন ভৌমিককে একটি পিতলের

ঘটি নিয়ে শীতলার পুকুর থেকে ভক্তির জল ভরতে দেখলাম। এর একটু পরেই, হিমাংশুবাবু তাঁর সম্মুখে রাখা পশুপ্রদীপ জেদে দক্ষিণ মুখে দাঁড়িয়ে, বেদীর উপর রাখা স্তূপ দুটিকে আরাতি করলেন। আরাতির সময় অন্যদের সঙ্গে মূলগায়ন বাসুদেব চক্রবর্তীও ওখানে উপস্থিত ছিলেন। বৃষ্টির কাছ একটি কালো চামর ধরে তিনি আরাতি দেখাছিলেন। ফুল দিয়ে আরাতি শেষ হলে হিমাংশুবাবু সেই ফুলটিকে পুকুরের জলে নিক্ষেপ করলেন। তারপর বাসুদেববাবুর কাছ থেকে চামরটি চেয়ে নিয়ে, পূজা স্থলে দোলাতে লাগলেন। এভাবে কিছুক্ষণ চামর বাজান করে, তিনি সেই চামরটি মূলগায়নকে ফিরিয়ে দিলেন। এছাড়া, যে পশুপ্রদীপের মাধ্যমে ইতিপূর্বে তিনি আরাতি করেছিলেন, সেই প্রদীপটিও এগিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রদীপের শিখা নেওয়ার উৎসাহে বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী এগিয়ে এলেন। একে একে তাঁদের শিখা নেওয়া শেষ হলে, পূজকে তাঁদের মঙ্গল কামনায় তিন বার শান্তি জল ছিটিয়ে দিলেন। শান্তিজল পাওয়ার আশায় ওখানে উপস্থিত সকলেই তখন মাথা নত করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাদের ঘড়িতে তখন রাত ১০টা ৫৫ মিনিট।

এর একটু পরেই হিমাংশুবাবু বরণ থালা থেকে একটি ছুরি তুলে নিলেন। এরপর পুকুরে না নেমে, ছুরিটি দিয়ে জলের উপরিভাগে একটি চৌকো ঘর কাটলেন। নিয়ম হল, ঐ নির্দিষ্ট স্থানের ঘটে জল ভরা হবে। এবার উনি বেদীর পূর্ব-পশ্চিমে বসানো দুটি ঘটের মধ্যে প্রথমে পূর্বদিকের ঘটটি হাতে নিয়ে ঐ ঘটের মুখে যে পশুপল্লব দেওয়া ছিল, সেগুলিকে ঘটের বাইরে এনে পুকুরে ধুয়ে নিলেন। ঘণ্টাকর্ণদেবের জন্য নির্দিষ্ট এই ঘটে যে পশুপল্লব দেখতে পেলাম, সেগুলি হল—আম, বট, অশথ, পাকুড় ও যক্ষ-ডুমুর। পশুপল্লবগুলি ধোয়ার পরে তিনি মাটির ঘটটিও পুকুরের জলে ধুয়ে নিলেন এবং ঐ সঙ্গে ঘটে পরিমাণ মত জল ভরে নিলেন। জল ভরবার নিয়ম হল—ঘটে ভরা জল যেন কোন কারণেই পুকুরে না ফিরে যায়। এভাবে ঘণ্টাকর্ণের ঘটে জল ভরা শেষ হলে, তিনি সেই পশুপল্লবগুলি পুনরায় ঘটের মুখে সাজিয়ে তাঁর সহকারী চণ্ডীবাবুকে ঐ ঘটটি ধরতে দিলেন। এরপর হিমাংশুবাবু বেদীর পশ্চিমে রাখা ঘটটি তুলে নিয়ে একইভাবে পশুপল্লব-গুলিকে ধুয়ে জল ভরলেন। শীতলার জন্য নির্দিষ্ট এই ঘটে যে পশুপল্লব-গুলি ছিল, সেগুলি হল—আম, বট, অশথ, কাঁঠাল ও বকুল। শীতলার ঘটে জল ভরা শেষ হলে, হিমাংশুবাবু ঐ ঘটটি নিজের হাতে পেখে, ঘণ্টাকর্ণের ঘট হাতে অপেক্ষারত চণ্ডীবাবুকে মন্দিরে ফিরে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঐ দুটি ঘটের উপরেই একটি করে গামছা ছিল।

ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে মন্দিরে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত পেয়ে, গ্রামের প্রতী শচীনন্দন ভৌমিক তাঁর হাতের জল ভরা ঘটি থেকে জল ছড়াতে-ছড়াতে, ব্রাহ্মণদের আগে-আগে চললেন। মন্দিরে ফেরার সময় শোভাযাত্রার চিহ্নটি

বিলম্ব এইরূপ—সর্বপ্রথমে ঢাকা; তার পেছনে গ্রামের কীর্তন দল; কীর্তন দলের পেছনে শীখ, ঘণ্টা ও কীসর; এবং ঔদের পেছনে জলের ঘটি হাতে রত্নী। রত্নীকে অনুসরণ করে ঘণ্টাকর্ণের ঘট হাতে ধীরপদে যাচ্ছিলেন চণ্ডীবাবু এবং তার পেছনে শীতলার ঘট নিয়ে হিমাংশুবাবু। গ্রামের মূখ্য প্রতিনিধি ও তার সহকারীবৃন্দ ছিলেন ঔদের পেছনে। এই শোভাযাত্রায় কয়েকটি হ্যাজাক আলোর ব্যবস্থা থাকায়, রাতের অন্ধকারেও বিশেষ কোন অসুবিধা হয়নি।

এই শোভাযাত্রাকে অনুসরণ করে আমরা যখন মন্দিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, সেই সময় জনৈক গ্রামবন্ধু আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বললেন—

“জল ঘট নিয়ে মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে, ব্রাহ্মণ ও বিশিষ্ট গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবী শীতলাকে ডাইনে রেখে, বাদ্যসহ মন্দির প্রদক্ষিণ করাই নিয়ম। এবটু পরেই সব কিছুর দেখতে পাবেন। আমরাও তেঁা সঙ্গে থাকব”।

গ্রামবন্ধুর কথা মত মন্দিরের সামনে এসে, ঔরা সকলেই শীতলা মন্দিরটিকে ডাইনে রেখে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন। এরপর রত্নী ও দুজন ব্রাহ্মণ মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে দালানে এলেন। ওখান থেকে হিমাংশু-বাবুই সর্বপ্রথমে শীতলার ঘট নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। মন্দির কক্ষে একটি সিংহাসনের উপর স্থাপিত পিতলের শীতলা মূর্তির সামনে আঁকা সর্বতো ভদ্রমণ্ডলের উপর, ঐ ঘটটিকে স্থাপন করতে দেখলাম। শীতলার ঘটটি স্থাপন করে, তিনি মন্দির কক্ষের ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে চণ্ডীবাবুর কাছ থেকে ঘণ্টাকর্ণের ঘটটি নিয়ে শীতলার ঘটের পশ্চিমে আঁকা ভদ্রমণ্ডলের উপর রেখে দিলেন। তখনও মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে ঢাকী ঢাক বাজাচ্ছিলেন। অপরপর বাদ্যের পাশাপাশি, কীর্তনদলের লোকেরাও নাম সংকীর্তনে উন্ময় ছিলেন। এত আনন্দের মাঝেও কিন্তু গ্রামবাসীদের চোখে-মুখে সেই একই উষ্মগ—কিভাবে মায়ের পূজাটি সন্দ্বন্দিত হবে! একটু পরেই ঘট স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার সংবাদ পেয়ে, সানন্দে সকলেই ‘গৌর প্রেমানন্দে হরি-হারি-বল, হরিবোল’ ধ্বনি দিলেন। হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে, কীর্তন ও সকল প্রকার বাদ্য বন্ধ হয়ে গেল। মন্দিরের সামনে তখন সকলেই ভক্তি ভরে দেবী শীতলাকে প্রণামে ব্যস্ত। আমাদের ঘড়িতে তখন রাত ১১টা ৭ মিনিট।

এর কিছুক্ষণ পরে, শান্ত দেবী শীতলার পূজায় ‘হরিধ্বনির’ তাৎপর্য সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে আমরা কীর্তন গানের আসরে ফিরে গেলাম। ঐ সময় অনেকেই কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলেন। ঔদের সকলেরই সেই একই কৌতূহল—

“আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? কেন এসেছেন? তাছাড়া, কেনই বা আমাদের গ্রামের এই পূজা নিয়ে এত লেখালেখি করছেন বা সব কিছুর ফটো তুলছেন?”

ঔদের এই কৌতূহলের উত্তরে জনৈক গ্রামবাসীই বললেন—

“আপনারা সবাই হয়তো না জানতে পারেন—কিন্তু আগাদের গ্রামের মূখ্য প্রতিনিধি ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ করে, তবেই এঁরা এই পূজা নিয়ে কাজ করতে এসেছেন। পরে এই পূজা নিয়ে একটা বই লেখার কথাও জানিয়েছেন। তাই এ বছর পূজাটা যাতে ভালভাবে হয়, সেজন্য সব রকম চেষ্টা করা হচ্ছে। শব্দু তাই নয়, মায়ের বিবাহের দিনে দূরবর্তী গ্রাম থেকে যারা আসবেন, তাঁদের যাতে স্থানাভাবে ফিরে যেতে না হয়—সেজন্য এবছর ঐ মন্দিরের পাশের জমিটা পরিস্কার করে, সেখানেও লোক বসানোর ব্যবস্থা হয়েছে। মায়ের বিয়ের দিনে মাইক ও ডাইনামো চালিয়ে আলোর ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এছাড়া, মায়ের পুরাতন কাঠের সিংহাসনের পরিবর্তে, নতুন একটি নক্সা করা কাঠের সিংহাসন তৈরী করা হয়েছে”।

এই সময় গুর কথায় বাধা দিয়ে জনৈক গ্রামীবাসী খুবই উৎসাহের সঙ্গে বললেন—

“দেখুন আজকের এই ঘট উত্তোলন অনুষ্ঠানে ক’জনই বা উপস্থিত হয়েছেন। লোকের ভীড় দেখবেন বিয়ের দিনে। কম করেও গুনিছ-থেকে আট হাজার লোক হবে। আমাদের গ্রামের ঘরে ঘরে তখন আত্মীয়-কুটুম্বের চাপ দেখলে আপনারাও অবাক হবেন। এক এক ঘরে দশ-পনেরো জন করে কুটুম্ব। অবস্থা ভাল হলে, কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চাশও পেরিয়ে যায়। ঝি-ঝিউড়ীরা দুর্গাপূজার সময় বাপের বাড়ি না এলেও চলে। কিন্তু সন্ন্যাসের সময় তারা আসবেই। আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধুদের রান্না-খাওয়ার কাজে ব্যস্ত থাকায়—দুঃখের কথা, অনেক বাড়ির মেয়েরা বিয়ের আসরে আসতে পারে না। শুনলাম, আপনারা এই সন্ন্যাসের কয়েকটা দিন আমাদের গ্রামের হারাদন আদকের বাড়িতে থাকবেন। তাই ঐ সময় আমার কথার সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে নেবেন”।

আমাদের এই আলোচনার সময় শীতলা মন্দিরের সামনে হঠাৎ একটা গোলমাল শব্দ হল। এর ফলে, যারা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন, তারা সকলেই মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন। দূর থেকে আমরা যেটুকু বুঝতে পারলাম, তা হল—পূজকদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের বিবাদ লেগেছে। এই বিবাদের কারণ হল—এ বছর মায়ের জন্য যে নক্সা-করা সিংহাসনটি তৈরী করানো হয়েছে, আজ সেই সিংহাসনের উপর দেবীর পিতলের মূর্তিটিকে বসানোর সময়, নক্সা করা অংশটি মায়ের কাপড়ে প্রায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছে। তাই গ্রামবাসীদের অভিমতে, যদি এই দাম্পত্য সিংহাসনের নক্সা করা অংশটুকু সবসামান্যের চোখে না পড়ে—তবে এত খরচপত্র করে নক্সা করা সিংহাসন তৈরীর সার্থকতা কোথায়। সন্দেহে এখনই দেবীকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে অথবা অন্য কোনভাবে এমন একটা ব্যবস্থা পূজকদের করতে হবে—যার ফলে, সিংহাসনের নক্সা করা অংশটুকু অবশ্যই সবসামান্যের দৃষ্টিগোচর হয়।

গ্রামবাসীদের সরব প্রতিবাদের উত্তরে দূর থেকে হিমাংশুবাবুকে বলতে শুনলাম—

“দেখুন, মাকে সাজিয়ে সিংহাসনে বসানোর পরে এবং বিশেষভাবে ঘট উস্তোলনের পরে, আপনারা যেসব ঘৃণীট ধরে পুনরায় মাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে সিংহাসনের নক্সার অংশ দেখানোর কথা বলছেন— শাস্ত্রমতে কখনও তা সম্ভব নয়। তাই আমার পক্ষে নতুনভাবে সিংহাসন সাজানো অসম্ভব। এখন যেভাবে আপনারা আমাকে দোষ দিচ্ছেন, সত্যই তা খুবই দুঃখের। মাকে সিংহাসনে বসানোর আগেও যদি আমাকে জানাতেন, তবে সেভাবেই কাজ করতাম। দোষটা কার বলুন— আমার না আপনাদের?”

এভাবে বেশ কিছুক্ষণ বিতর্কের পরে, গ্রামের মূখ্য প্রতিনিধি বীরেন্দ্রনাথ প্রধান এবং অপর কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রামবাসীর হস্তক্ষেপে, পারস্পরিক মতান্তরের অবসান হল। ফলে, হীতপূর্বে মাকে যেভাবে সিংহাসনের উপর সাজানো হয়েছিল, সেভাবেই তিনি থাকলেন। গ্রাম-ষোল-আনার পক্ষ থেকে এই বিতর্কের অবসান ঘটানর সঙ্গে সঙ্গে, মন্দির প্রাক্তনে উপস্থিত সকলেই বেশ কয়েকবার ‘গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বল—হরিবোল’ ধ্বনি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। অবশ্য তা হলেও—মায়ের পূজার দিনে এই অপপ্রীতিকর ঘটনার জন্য, অনেকেই আমাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

### ব্রতীর সংকল্প ও গায়ের বরণ

মন্দিরে ঘট প্রতিষ্ঠার বেশ কিছুক্ষণ পরে, রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটোর সময় গ্রাম-ষোল-আনার পক্ষ থেকে নির্বাচিত ব্রতী শচীনন্দন ভৌমিক ও সন্নাল গানের দলের মূলগায়ের বাসুদেব চক্রবর্তীকে চামর হাতে শীতলা মন্দিরের দালানে উপস্থিত হতে দেখলাম। এখানে হিমাংশুবাবুর নির্দেশে, শচীনন্দনবাবু মন্দিরের দালানে উত্তরমুখে এবং বাসুদেববাবু পূর্বে মুখে আসন গ্রহণ করলেন। হিমাংশুবাবু তাঁদের সামনে পশ্চিম মুখে আসনের উপর বসলেন। তাঁর সামনে যে-সকল পূজার উপকরণ চোখে পড়ল, তা হল—কোষা-কোষী, পেতলের ঘটিতে জল, কলাপাতার উপরে-ফুল, মালা, শ্বেত চন্দন, গোটা পান, গোটা সুপারি, কুশ, দুর্বা, বরণ-বস্ত্র ও নৈবেদ্য। এছাড়া, একধারে একটি মাটির সর।

সংকল্পের শুরুর্তে হিমাংশুবাবু ব্রতীকে আচমন করতে বললেন। ব্রতী তাঁর কথামত তিনবার আচমন করে, মন্ত্রপাঠ ও অপরাপর আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া পালন করতে লাগলেন। ঐ সময় ব্রতীর গায়ে নাগাবলী ও ডানহাতের অনামিকায় কুশের আংটি পরা ছিল। আনুষ্ঠানের সময় মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে ব্রতী যে সকল উপকরণ ব্যবহার করছিলেন, পরে তাঁকে একটি মাটির সরায় ওগুনালিকে রাখতে দেখলাম। এভাবে কিছুক্ষণ

কাজ চলার পরে, হিমাংশুবাবুদের ইঙ্গিতে ব্রতী ও মূলগায়নের উভয়েই ডানহাতে কিছুটা জল নিয়ে, পূজকের উচ্চারিত মন্ত্রের অনুসরণে আবৃত্তি করে চললেন। এই মন্ত্রপাঠের শেষে, উভয়েই তাঁদের হাতের জল মাটির সরায় ফেলে দিলেন। এরপর ব্রতী একটি মালা তুলে নিয়ে, ভক্তির মূলগায়নকে মাল্যদান করলেন। শুধু তাই নয়, একটি নতুন ধূতি নিয়ে, মূল গায়নের হাতে দিলেন। বাস্তবে, এই সকল নিয়ম পালনের মাধ্যমে—মূলগায়নকে দেবীর সরাল গান পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হল।

এভাবে গায়ন-বরণের কাজ শেষ হলে, ব্রতী পূজকের পদধূলি নিলেন। এরপর তিনি গায়নের ডানহাতের উপর তাঁর ডানহাত স্থাপন করে, পূজকের উচ্চারিত মন্ত্রের অনুসরণে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন। এই মন্ত্রপাঠের কাজ শেষ হলে, ব্রতী কয়েকটি গোটা বাঙলা-পান ও গোটা-সুপারি নিয়ে মূলগায়নের হাতে দিলেন। গায়ন এই পান-সুপারি দু-হাত পেতে গ্রহণ করে, জোড়হাতে বসে থাকলেন। বাস্তবে, এই প্রতীকী পান-সুপারি গ্রহণের ফলে—তিনি যে এই পূজায় সরাল গান পরিচালনার সমূহ দায়িত্ব নিলেন, তা প্রকাশ পেল। এরপরে ব্রতী মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে প্রথমে পূজক ও পরে ব্রাহ্মণ গায়নকে প্রণাম করে, তাঁদের পদধূলি মাথায় নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মূলগায়নও পূর্ব মুখে হাঁটু গেড়ে বসে প্রথমে দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। পরে পূজকের পা-ছুঁয়ে প্রণাম করে, সেই পদধূলি মাথায় নিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে, সংকল্প ও বরণের কাজে ব্যবহৃত ফুল, জল ইত্যাদি যে মাটির সরায় রাখা ছিল, ব্রতী সেটি ওখান থেকে তুলে নিয়ে শীতলার পুকুরে ফেলতে গেলেন। ঐ সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও মূলগায়ন তাঁদের নিজ-নিজ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

কথা প্রসঙ্গে হিমাংশুবাবু আগাদের জানালেন—

“সারা বছর মায়ের মন্দিরে পূজা করলেও, এই সরাল পূজার সময় গ্রাম-ঘোল-আনার পক্ষ থেকে নিযুক্ত ব্রতীকে প্রথমেই ব্রাহ্মণ-বরণ করতে হয়। তবে, তন্ত্রধারক-বরণের সময় ব্রতীর উপস্থিতি প্রয়োজন হয় না। যেমন, আজও তিনি ছিলেন না। জানি না ব্রাহ্মণ-বরণের সময় আপনারা এটা লক্ষ্য করেছেন কিনা! কারণ, ঐ অনুষ্ঠানটি তো খুবই সংক্ষিপ্ত। বাইহোক, ব্রাহ্মণ-বরণ অনুষ্ঠানের সময় ব্রাহ্মণ ও তন্ত্রধারক উভয়েই দশটি সুপারি ও বরণ-বস্ত্র পাওয়ার অধিকারী। মূলগায়নের ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম। এছাড়া, বরণ-দক্ষিণা তো আছেই। বলতে গেলে, এরকম খুঁটিনাটি নিয়ম আরও তো অনেক কিছুই আছে। প্রয়োজন হলে, পরে জেনে নেবেন। আমার এখন কথা বলার সময় নেই। এক্ষুনি আবার আসরে চামর পাঠাতে হবে।”

ব্রতীর সঙ্গে আলোচনা করে জানলাম যে—সংকল্প অনুষ্ঠানের

দায়িত্ব থাকায়, সন্ধ্যা পূজা আরম্ভের পূর্বাধিন ঠিকে নিরামিষ খেতে হয়। শূদ্র তাই নয়, আজ সকাল থেকেই উনি নিরামিষ খাওয়া দূরের কথা—নির্জলা উপবাসেই আছেন। এছাড়া, এঁদের গ্রামের নিয়ম অনুসারে, ব্রাহ্মণ-বরণ ও মূলগায়নকে বরণের প্রয়োজনে—গ্রামের সন্ধ্যা আরম্ভের পূর্বাধিন থেকে বরণের অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত, ঠিরাও নিরামিষ খেয়ে থাকেন। শূদ্রাচারে থেকে সংঘম পালন করেন।

আমাদের এই আলোচনার সময় সন্ধ্যা গানের দলের একজন একটি হারমোনিয়ম এনে, শীতলা মন্দিরের দালানে রেখে ভক্তিরে প্রণাম করলেন। এরপর দেবী-দর্শন করে, সেই হারমোনিয়মটি তুলে নিয়ে আসরে ফিরে গেলেন। আমাদের ঘড়িতে তখন রাত একটা।

মন্দির থেকে গানের আসরে এসে দেখলাম—আসরে তখন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে কয়েকজন গিষ্ঠপী উপস্থিত থাকলেও মূলগায়ন বাসুদেববাবু কিন্তু তখনও অনুপস্থিত। অবশ্য ইতিপূর্বে মন্দিরে প্রণাম করে যে চামরটি আসরে নিয়ে আসা হয়েছিল, সেটি হারমোনিয়মের সামনে একটুকরো কাপড়ের উপর শোয়ানো ছিল। আমাদের দেখে কয়েকজন গ্রামবাসী আসরে বসবার জন্য অনুরোধ জানালেন। এইসময় বেশ কিছু প্রোভার অনুরোধে, দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামে যে শীতলা মঙ্গলের দল আছে—সেই দলের মূলগায়ন হরিপদ মেট্টা মহাশয় আসরে এসে ডানহাতে ঐ চামরটি তুলে নিয়ে, উত্তর মূখে শীতলা মন্দিরের দিকে চেয়ে চামরটি ব্যঞ্জন করতে লাগলেন। এভাবে কিছুক্ষণ চামর ব্যঞ্জন করে, প্রথমে ঠির ডান দিকে ও পরে বামে রাখা খ্রীখালের উপর চামরটিকে স্পর্শ করালেন। এভাবে অপরাপর বাদ্যযন্ত্রে চামর স্পর্শ করানো হলে, হরিপদবাবু দেবীর উদ্দেশে আসর থেকে ভক্তিরে প্রণাম জানালেন। ঠির প্রণামের শেষে বাদকেরা তাঁদের নিজ-নিজ যন্ত্রগুলিতে সুর মিলিয়ে নিতে লাগলেন। সুর মেলানো শেষ হলে—হরিপদবাবু আসরের মধ্যস্থলে বসে চামর হাতে মন্দিরের দিকে মূখ্য করে, বন্দনা গান শুরুর করলেন।

কিছুক্ষণ বন্দনা গান চলবার পরে, বিহরাগত মূলগায়ন বাসুদেব চক্রবর্তী যন্ত্রপদে আসরে এসে উপস্থিত হলেন। ওখানে উনি প্রথমে উত্তরমূখে মায়ের মন্দিরের দিকে তাকিয়ে, হাতজোড় করে প্রণাম জানালেন। তারপর উনি বন্দনা গানে রত হরিপদবাবুর বামদিকে হাঁটু গেড়ে বসে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে, চামরটি দেওয়ার জন্য হরিপদবাবুকে ইঙ্গিত করলেন। তাই হরিপদবাবু তাঁর হাতের চামরটি বাসুদেববাবুকে ভক্তিরে সমর্পণ করলে, সেটি গ্রহণ করে বাসুদেব বাসুদেব মাথায় ঠেকালেন। উল্লেখ্য যে, চামরটি হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মূলগায়নকে আসরের মধ্যস্থলে বসতে দিয়ে, হরিপদবাবু কিছুটা সরে বসলেন। এর ফলে, ইতিমধ্যে জমে ওঠা বন্দনা গানের সুর-তাল বজায় রেখে, তৎক্ষণাৎ বাসুদেববাবুকে

গান ধরতে হল। পাঁচাল গানের বৈশিষ্ট্য অনুসারে, দোহারগণও তাঁকে সহায়তা করতে লাগলেন। এছাড়া, বন্দনা গানের কোন কোন অংশে মূলগায়নকে কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ দিয়ে হরিপদবাবু নিজেও গান করছিলেন। যাইহোক, নতুন মূলগায়ন বাসুদেববাবুর গুণোৎকর্ষ সম্পর্কে অনেকের সংশয় থাকলেও, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি সকলের অন্তর জয় করলেন।

### মন্দিরে পূজা

সয়াল গানের আসরে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে, আগরা শীতলা মন্দিরে যুগলাম। দেখলাম, দেবীকে বামে রেখে হিমাংশুবাবু তখন পূর্বমুখে পূজায় বসেছেন। পূজার কাজে ঠুকে সহায়তা করছেন চণ্ডীচরণ মিশ্র ও নারায়ণ চন্দ্র করশর্মা। ইঙ্গিতে চণ্ডীবাবু মন্দিরবক্ষের বাইরে গিয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে বললেন। ঐ সময় মন্দিরের দালানে বেশকিছু মহিলার সমাগম চোখে পড়ল। ওঁদের মধ্যে এক বৃদ্ধার কাছে পূজা আরম্ভের সঠিক সময় সম্পর্কে জানতে চাইলে, তিনি বললেন—

“দেখুন, আমি ঠিক বলতে পারব না। তবে, আমি তো আসরে গান আরম্ভের আগেই মন্দিরে এসেছি—তাই বলছি, ঐ গান আরম্ভের কিছুটা পরেই বাসুদেববাবুর পূজায় বসেছেন। আমাদের গ্রামের নিয়ম হল—মায়ের পূজা ও সয়ালগান একই সঙ্গে চলবে। তাছাড়া, এখন এই যে বন্দনা গান হচ্ছে, সেটা তো বলতে গেলে—মায়ের আনন্দের কারণেই। একটু আগে আপনারা এলে—চণ্ডীবাবুর কাছে সব কিছু জেনে নিতে পারতেন।”

এরপর আমরা পূজকদের নির্দেশমত মন্দির বক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলাম সিংগেটের তৈরী বেদীর উপর নবনির্মিত কাঠের সিংহাসনে দেবীর পিতলের মূর্তিটি সুদৃশ্যভাবে সাজানো হয়েছে। তবে, মূর্তি অর্থে দেবীর পূর্ণ-অবয়ব নয়। একটি পিতলের তৈরী কলসের উপর স্থাপিত দেবীর গুণাবল্লব ও সামনে প্রসারিত দুটি বাহু। এই কলসটিকে এমনভাবে শাড়ি পরানো হয়েছে যে, দেবী যেন সতাই মাতুরূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। দেবীর মাথায় রূপোর মুকুট। নাকে সোনার নখ। দু-হাতে চুড়ি, শাঁখা ও নোয়া। বাম হাতে শোলার চাঁদমালা ও গলায় রঙিন কাগজের ও ফুলের মালা। মায়ের সিংহাসনের দুপাশে মালাকারের তৈরী শোলার ফুলছাঁড়ি। সিংহাসনের মাথার উপরে শোলার পঞ্চঝারা ও নবঝারা ছাড়াও রঙিন কাগজের তৈরী ফুল-মালা। এছাড়া, যে সিংগেটের বেদীর উপর সিংহাসনটি বসানো হয়েছে, সেই বেদীর চারকোণে চারটি কাদার ডেলার উপর চারটি তীরকাঠি লম্বাভাবে পুতে, সেই কাঠিগুলির মাথায় মাড়বিহীন আবাসুতো দিয়ে, বেদী সহ সিংহাসনটিকে চৌকোভাবে আবদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া, মায়ের সিংহাসনের উত্তরে প্রায় দেওয়াল ঘেঁসে একটি বড় চন্দ্র টাঙানোর ফলে, সমগ্র মন্দিরকক্ষটি সুদৃশ্য আকার ধারণ করেছে।

এই বেদীর নীচে মেঝের উপর দুটি ঘট পূর্ব-পশ্চিমে বসানো হয়েছে । এই দুটি ঘটের মধ্যে পশ্চিম দিকের ঘটটি ঘণ্টাকর্ণদেবের ও পূর্বদিকের ঘটটি শীতলার । এই ঘট দুটির সামান্য দক্ষিণে, নির্দিষ্ট পাথরের উপর একটি দর্পণ মায়ের দিকে ফেরানো এবং রক্ষার পূর্ণ পাত্রটি শীতলার ঘটের কিছুটা পূর্বে বসানো । এছাড়া, যে বেদীর উপর শীতলার সিংহাসনটি বসানো হয়েছে, সেই বেদীর সীমারেখার মধ্যে ঘণ্টাকর্ণ, শীতলা ও দর্পণসহ পাত্রটি স্থান পেলেও রক্ষার পূর্ণ পাত্রটি কিন্তু বেদীর বাইরেই বসানো হয়েছে ।

দেবী শীতলার পশ্চিমে প্রায় একই সমান্তরালে, অপর একটি কাঠের সিংহাসন দেখতে পেলাম । ঐ সিংহাসনের উপর দক্ষিণমুখে দণ্ডায়মান গোবিন্দজীউর প্রস্তরমূর্তিটির হাতে কোন বাঁশ না থাকলেও দুটি হাতের মূদ্রা কিন্তু এমনই যে, উনি যেন সত্যিই বাঁশ বাজাচ্ছেন । ঠুঁর গলায় উপবীতের চিহ্নটিও বেশ স্পষ্ট । শীতলা মন্দিরে গোবিন্দজীউর অবস্থান সম্পর্কে আমাদের পূর্বপরিচিতা মহিলার কাছে কৌতূহল প্রকাশ করলে উনি বললেন—

‘‘ঐ যে চণ্ডীঠাকুর পূজার কাজে বাস্ত আছেন, ঠুঁই গোবিন্দজীউর অধিকারী । আগে উনি চণ্ডীবাবুদের মাটির মন্দিরেই থাকতেন । তবে এখন সেই মন্দিরটি আর নেই । তাই গ্রামবাসীদের অনুমতি নিয়ে, শীতলা মন্দিরের মধ্যেই গোবিন্দজীউকে স্থান দেওয়া হয়েছে । এখানেই ঠুঁর নিত্যপূজা হয় ।’’

ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলে মন্দিরকে ঊঁকি মেরে দেখলাম—গোবিন্দ জীউকে তাঁর বামে রেখে, হিমাংশুবাবু শীতলা ও অপরাপর দেবদেবীর পূজা করছেন । পূজকের ডান পাশে, পিতলের ঘটিতে রাখা পুকুর থেকে আনা জল । বামে পূজার ঘণ্টা । সামনে পানিশথ । কোষায় ভরা জল এবং কোষার একপ্রান্তে কুঁষ । পূতপ পাথরের উপর লাল পদ্ম, রক্তকরবী, নীল অপরািজিতা, রক্তজবা, হলুদ বলকে, সাদা টগর, সাদা ধূতরো, শ্যামা দূর্বা, দূর্বা, বাবই তুলসী, শ্বেত ও লাল তুলসী, বেলপাতা, শ্বেত ও রক্ত চন্দন, আতপ চাল ইত্যাদি । এগুঁলের সামনে কয়েকটি পাথ্রে সাজানো ছিল— আড়াই কেজি আতপ চালের নৈবেদ্য, ক্ষীর, ছানা, মিষ্টি, নানা প্রকার বাটা ফল, ডাব, সাজা পান ও জল । এছাড়া, পূজকের কাছে ধূপ-ধূনা এবং মাটির দীপাসনের উপর জ্বলন্ত একটি প্রদীপ ও কিছুটা দূরে একটি জাগ প্রদীপ । নিয়ম হল—পূজার সূচনা থেকে সমাপ্ত পর্যন্ত এই জাগপ্রদীপটি যেন ঠিক একইভাবে জ্বলে । কোন কারণে এই প্রদীপটি নির্বাণিত হলে, কেবল পূজকেরই নয়, সমগ্র গ্রাম-ষোল-আনারই অঙ্গুল হবে—এরইম হোক বিশ্বাস । এই জাগ প্রদীপটি দেখাশুনোর মূল দায়িত্ব কিন্তু ভাড়ারী চণ্ডীচরণ আদকের ।

কিছুক্ষণ পরে চণ্ডীবাবু মন্দিরকক্ষের বাইরে এসে দাঁড়ালে, আমরা ঠুঁর কাছে জানতে চাইলাম যে, পূজা আরম্ভের পূর্বে এবং ঘট উত্তোলনের পরে,

মন্দিরে ফিরে এসে কি কি আয়োজন সম্পূর্ণ করতে হয়েছে।" প্রশ্নের উত্তরে চণ্ডীবাবু বললেন—“সে তো অনেক কথা। তার চেয়ে বরং ঠিক কোন ব্যাপারটা আপনারা জানতে চাইছেন, সেটা বরং একটু বাচক দিয়ে বলুন।”

চণ্ডীবাবুর কাছে সহযোগিতার আশ্বাস পেয়ে ঘট উত্তোলনে যাওয়ার প্রস্তুতিপর্ব সম্পর্কে জানতে চাইলাম। উনি বললেন, “এখন আমার পক্ষে সব কিছুর বন্ধিয়ে বলবার মত সময় নেই। তাছাড়া আপনারাও তো সামনে থেকে কিছুরটা দেখেছেন। তাই সহজেই বুঝে নিতে পারবেন।”

ঐ সময় চণ্ডীবাবু আমাদের ঘেটুকু বলেছিলেন, তা হল—“শুদ্ধ অননুষ্ঠান আরম্ভের প্রতীক স্বরূপ আজ বিকেলের দিকে কল্লেকজন গ্রামবাসী একটি জন্নদাড়ির সঙ্গে সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া আমপাতা ও ফুল গুঁথে, শীতলা মন্দিরের চতুর্দিকে টাঙিয়েছেন। মন্দিরে ওঠবার সিঁড়ির দুধারেও তাঁরা একটি করে কলাগাছ পুঁতে, তার প্রত্যেকটির গোড়ায় নতুন পাটের বিঁড়ার উপর তেল-সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া জলভরা উপঘট স্থাপন করেছেন। পরে ঐ প্রত্যেকটি উপঘটের মুখে, তেল-সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া একটি করে আমসার এবং ঐ আমসারের উপরে তেল-সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া সশীষ ডাব বাসিয়েছেন। শুদ্ধ তাই নয়, এখন মন্দির প্রাঙ্গণে যেখানে সয়াল গানের আসর বসেছে, সেখানেও তাঁরা জমির উপর মাটি ফেলে একটি উঁচু বেদী তৈরী করেছেন। ঐ বেদীর উপরে বাঁশের খুঁটি পুঁতে কাঠামোর উপর খড়ের ছাউনি বিছিয়ে মেরাপ বেঁধেছেন। অবশ্য এসব কাজের জন্য অননুষ্ঠানের পূর্বেই গ্রামের বিভিন্ন লোককে ভার দেওয়া থাকে। সময়মত এসে তাঁরাই সবকিছুর করেন। এসব তো হল মন্দিরের বাইরের কাজ। মন্দিরকক্ষে আমাদের, গানে ব্রাহ্মণদের যে সব কাজ সম্পূর্ণ করতে হয়েছে, এবার সে সম্পর্কে বরং কিছুরটা বলি।

দেবী শীতলার সিংহাসনের সামনে ঘট বসানোর প্রয়োজনে, সবপ্রথমে মন্দিরকক্ষের মেঝেটি ভাল করে ধুতে হয়েছে। এরপর মেঝেটি শুকিয়ে গেলে পশুগুঁড়ি অর্থাৎ—আতপ চালের গুঁড়ি, হলুদ গুঁড়ি, বেলপাতা গুঁড়ি, আগড়া পোড়া গুঁড়ি ও আবীর দিয়ে—ঘণ্টাকণের ঘট স্থাপনের জন্য ভদ্রমণ্ডল এবং শীতলার ঘট স্থাপনের জন্য সর্বতো ভদ্রমণ্ডল আঁকতে হয়েছে। মণ্ডল আঁকার কাজ মিটলে, ব্রহ্মার পূর্ণপাঠ ও দর্পণের পাঠ স্থাপনের জন্য আতপ চালের গুঁড়ি দিয়ে দুইটি অষ্টদলপদ্ম আঁকতে হয়েছে। আমাদের মধ্যে হিমাংশুবাবুই ওগুঁড়ি এঁকেছেন।

এবার ঘট সাজানোর কথায় আসি। একটু আগে যে ঘটগুঁড়ির কথা বলেছিলাম—সেগুঁড়ি ছাড়াও, ব্রহ্মার পূর্ণপাঠ ও দর্পণ স্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট পাত্রের গায়ে আতপ চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী পিটুলির সঙ্গে সবেঁধি গুলে মাখাতে হয়েছে। ঐ প্রলেপ শুকিয়ে গেলে, একটি পাত্রে সরষেতেলের সঙ্গে সিঁদুর মিশিয়ে, ঘণ্টাকণের ঘটে পুঁতুল, শীতলার ঘটে দেবীমুখ এবং ব্রহ্মার পূর্ণপাঠ ও দর্পণ স্থাপনের জন্য

নির্দিষ্ট পাত্রের গায়ে, অর্ধচন্দ্রের মধ্যে ফোটা আঁকতে হয়েছে। এভাবে প্রতীক আঁকবার কাজ শেষ হলে, ঘণ্টাকর্ণ ও শীতলার ঘণ্টের মূখে বসানোর জন্য যে দুটি সশীষ ডাব লাগে—তার মধ্যে ঘণ্টাকর্ণের ঘণ্টে স্থাপনের জন্য ডাবের গায়ে অর্ধচন্দ্রের মধ্যে ফোটা আঁকা, পরে শীতলার ঘণ্টে স্থাপনের জন্য ডাবের গায়ে দেবীমুখ আঁকা হয়েছে। এরপর চারটি মাটির ভাড়ের গলাতেই অক্ষসূত্র বাঁধতে হয়েছে। অক্ষসূত্র বলতে—হলদুদ ছোয়ানো সাদা সূতায় পাঁচটি করে দুর্বা বেঁধে দেওয়া। এসব কাজ মিটলে, হাতপূর্বে ভেঙে আনা পঞ্চপল্লবগুলি ঘণ্টাকর্ণ ও শীতলার ঘণ্টের মূখে রাখা হয়েছে। শাস্ত্রমতে নিয়ম হল—ঘণ্টাকর্ণের ঘণ্টে থাকবে আম, অশখ, বট, পাকুড় ও যজ্ঞডম্বুর এবং শীতলার ঘণ্টে আম, অশখ, বট, কাঁটাল ও বকুল।

পরবর্তী কাজ হল বরণ-খালা সাজানো। বেশ কয়েকপ্রকার মাস্তুলিক উপকরণ দিয়ে বরণ-খালা সাজাতে হয়। এর কয়েকটি হল—মহী, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দুর্বা, তৈল-হরিদ্রা, অখণ্ড কদলীছড়া, দধি, ঘৃত, স্বাস্তিক, শংখ, সিঁদুর, কঞ্জল, রোচনা, সিদ্ধার্থ, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দর্পণ, অলঙ্ক, হরিদ্রাসূত্র, লৌহ, চামর, দীপ ইত্যাদি।

এরপর যেসব কাজ করতে হয়েছে, তা হল—সন্ধ্যা পূজা উপলক্ষ্যে দেবী শীতলার পিতলের মূর্তিটি মার্জনা করে নতুন শাড়ি, অলংকার, শাখা, গোল্লা, সিঁদুর দিয়ে সাজিয়ে, নবনির্মিত কাঠের সিংহাসনে বসানো। ঐ সিংহাসনটি মালাকারের তৈরী শোলার জিনিস ও ফুল-মালা দিয়ে সাজাতে হয়। অবশ্য, পুকুরে ঘট ডোবানোর সময় আমি ও হিমাংশুদেব যখন পূজার কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তখন আপনারা তো নিজেরাই সর্বাঙ্ক দেখেছেন, ফটো তুলেছেন।

ঘট উত্তোলন করে মন্দিরে ফিরে এসে আমাদের যে সব কাজ করতে হয়েছে, এবার সে সম্পর্কে কিছু বলি। আজ মন্দিরকক্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘট স্থাপনের পূর্বে, ঘণ্টাকর্ণ ও শীতলার জলঘণ্টের মধ্যে যে সকল উপকরণ দিতে হয়েছিল, সেগুলি হল—পঞ্চরত্ন ও নবরত্নের মূল্যস্বরূপ চোন্দ সিঁদুর পয়সা। এছাড়া, সর্বাঙ্ক, হরিভাল, হরীতকী, শ্বেত সরিষা, যধান, সপ্তমূর্তিকা, শ্বেত ও রক্তচন্দন, আতপ চাল, দুর্বা এবং কপূর দেওয়া হয়েছিল।

একটু থেমে, মন্দিরকক্ষে স্থাপিত ঘটগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চণ্ডীদেব বললেন—“ওখানে ঐ ভদ্রমণ্ডলের উপরে প্রথমে সাদা ভাইচূর্ণ ধান বিছিয়ে এবং পরে সেই ধানের উপর নতুন একটি পাত্রের বিঁড়া বাসিয়ে, ঘণ্টাকর্ণের ঘণ্টাটি বসাতে হয়েছে। ঐ ঘণ্টাটির গায়ে তেল-সিঁদুর দিয়ে পুতুল একে পরে ঐ ঘণ্টের গলায় অক্ষসূত্র বাঁধা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, ঘণ্টের গায়ে অঙ্কিত ঐ পুতুলটিকে ভিতরে রেখে নীচের থেকে উপরে প্রায় অর্ধগোলাকার একটি সিঁদুরের রেখা

টেনে দেওয়া হয়েছে। এই পুতুলটি হল ঘণ্টাকর্ণের প্রতীক। এছাড়া এ ঘণ্টের মূখে সাজানো পঞ্চপল্লবের উপর আতপ চালপূর্ণ যে নতুন মাটির সরটি বসানো হয়েছে, তাতে একটি সিকি দেওয়া আছে। পরিশেষে ঐ সরার উপর অঙ্কচন্দ্রের মধ্যে ফোঁটা আঁকা একটি সশীষ ডাব এবং ঐ ডাবের শীষে মালাকারের তৈরী শোলার চাঁদমালা ঝুলিয়ে, ঘণ্টের উপরে একটি নতুন গামছার আচ্ছাদন দেওয়া হয়েছে। ঘণ্টাকর্ণের ঘণ্টের উপরে যে ফুলের মালাটি দেওয়া আছে, সেটা তো ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছেন।

ঘণ্টাকর্ণের ঘণ্টের পূর্বদিকে দেবী শীতলার ঘট। এই ঘটটিকেও পূর্বের ন্যায় পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে আঁকা সর্বতোভদ্রমণ্ডলের উপর একইভাবে স্থাপন করা হয়েছে। ঐ ঘণ্টের গায়ে সিঁদূর দিয়ে আঁকা একটি ঠিকোণ দেবীমূর্তিকে ভিতরে রেখে, পূর্বের মত অঙ্কগোলাকার একটি সিঁদূরের রেখা টেনে দেওয়া হয়েছে। এই দেবীমূর্তির একটি কোণ নিম্নমুখী এবং উপরের চওড়া অংশটি উর্ধ্বমুখী। ঘণ্টের গলায় একটি অক্ষসূত্র বাঁধা। এছাড়া, ঘণ্টের মূখে পঞ্চপল্লবের উপর আতপ চালপূর্ণ মাটির সরায় একটি সিকি, দেবীমূর্তি আঁকা সশীষ ডাব, চাঁদমালা, গামছা ও ফুলের মালা দেওয়ার পদ্ধতি—ঘণ্টাকর্ণের ঘণ্টেরই প্রায় অনুরূপ।

শীতলার ঘণ্টের পূর্বদিকে প্রায় একই সমান্তরালে, ব্রহ্মার মাটির পূর্ণপ্রাচীর অবস্থান। আতপচাল গুঁড়ি দিয়ে আঁকা অষ্টদল পদ্মের উপর সাদা তাইচুং ধান বিছিয়ে এবং পরে তার উপরে একটি পাটের বিঁড়া রেখে পূর্ণপ্রাচীর বসানো হয়েছে। এছাড়া পূর্ণপ্রাচীর গায়ে তেলসিঁদূর দিয়ে একটি ফোঁটা এঁকে, প্রায় অঙ্কগোলাকৃতি একটি রেখার বেষ্টিনে ঐ ফোঁটাটিকে আবদ্ধ করা হয়েছে। পূর্ণপ্রাচীর গলাতেও অক্ষসূত্র বাঁধা আছে। তবে, পূর্ণপ্রাচীর ক্ষেত্রে যেটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা হল—দেবী শীতলার স্নায় পূজায় যিনি ব্রহ্মী, কেবলমাত্র তাঁর হাতের দশ ছাপাম মূঠো আতপচাল পূর্ণপ্রাচীর দিতে হয়। এছাড়া, পূর্ণপ্রাচীর মধ্যে একটি ছাড়ানো গোটা নারকেল, দশটি করে গোটা পান ও গোটা সূপারি এবং একটি সিকিও দেওয়া থাকে। শেষে, পূর্ণপ্রাচীরকে একটি নতুন গামছা, চাঁদমালা ও মালা দিয়ে সাজাতে হয়।

এবার বলি, ঘণ্টাকর্ণ ও শীতলার ঘণ্টের সামান্য দক্ষিণে দর্পণসহ যে প্রাচীর স্থাপন করা হয়েছে, সেটি আতপচালের গুঁড়ি দিয়ে আঁকা অষ্টদল পদ্মের উপর সাদা তাইচুং ধান বিছিয়ে একটি পাটের বিঁড়ার উপর বসানো হয়। ঐ প্রাচীর গায়ে তেলসিঁদূর দিয়ে যে প্রতীকটি আঁকা হয়েছে, তা পূর্ণপ্রাচীরই অনুরূপ। এছাড়া, ঐ প্রাচীর গলায় অক্ষসূত্র, ভিতরে একটি আমসার ও একটি সিকি দেওয়া আছে। পরে ঐ প্রাচীর নতুন গামছা দিয়ে ঢেকে, তার উপরে একটি দর্পণ দেবী শীতলার মূর্তির দিকে ফিরিয়ে বসানো হয়েছে। উদ্দেশ্য হল—ঐ দর্পণে যেন দেবীমূর্তির প্রতিবিম্ব ধরা পড়ে।

তবে দর্পণের কাঁচের উপরে তেল-সিঁদুর দিয়ে যে 'ঠ' লেখা আছে, সেটি অবশ্য আপনারা এখান থেকে দেখতে পাবেন না। মনে রাখবেন—অপরূপার ঘট ও পূর্ণপাঠের সঙ্গে চাঁদমালা দেওয়ার নিয়ম থাকলেও, দর্পণযুক্ত পাত্রটিতে কিন্তু চাঁদমালা থাকে না। তাই 'দর্পণ ঘট' শব্দটি ব্যবহার না করে, সঠিক অর্থে 'দর্পণ রাখার পাত্র বলাই বুদ্ধিযুক্ত। সে যাইহোক, ঐ দর্পণ রাখবার পাত্রটির পাশে যে নতুন মাটির সরটি দেখতে পাচ্ছেন, ওতে কিন্তু মায়ের স্নানজল রাখাই নিয়ম।”

আলোচনা প্রসঙ্গে চণ্ডীবাবুর কাছে আমাদের প্রশ্ন ছিল, মায়ের পূজার ব্যবস্থার ফুল সম্পর্কে। একটু ভেবে চণ্ডীবাবু বললেন, “আপনারা বরং আজ যে সকল ফুল দিয়ে পূজা হচ্ছে, তা থেকে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারেন। তবে এই ফুলগুলি প্রতিদিন দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, ওগুলো ঠিকমত যোগাড় করার কামেলা অনেক। তা হলেও, আজ যে সব ফুল দিয়ে এখানে পূজা হচ্ছে এবং ফুল ছাড়াও আর যে সকল পূজার উপকরণ পূর্ণপাঠে দেখতে পাচ্ছেন, এবার বরং সে সম্পর্কে কিছু বলি। পরে হিমাংশুবাবুর কাছে বিভিন্ন দেবদেবীর সঙ্গে নানারকম ফুলের প্রতীকী আধ্যাত্মিক যোগাযোগের বিষয়টা জেনে নিতে পারেন।

আজ যে সকল ফুল দিয়ে হিমাংশুবাবু পূজা করছেন, তার মধ্যে আছে—লালপদ্ম, রক্তকরবী, নীল অপরািজতা এবং দুর্বার মধ্যে শামা দুর্বা। এই সঙ্গে অপরূপার দেব দেবীর পূজার কারণে—কলকে, টগর, রক্তজবা ইত্যাদি সাধারণ ফুলও পূর্ণপাঠে রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, শিবপূজার জন্য সাদা ধতুরা ও বিল্বপত্র এবং শালগ্রাম শিলারূপী রঘুনাথ জাঁউর পূজার জন্য শ্বেতপুষ্প ও বাবই তুলসীও সংগ্রহ করতে হয়েছে। বাস্তবে, যেহেতু এই শীতলা মন্দিরে শালগ্রাম শিলা রেখে নিত্যপূজার কোন প্রথা নেই, তাই কেবলমাত্র এই সন্মাল পূজার সময় হিমাংশুবাবুর গৃহদেবতাকেই মন্দিরে এনে শালগ্রাম শিলার প্রয়োজন মেটানো হয়।”

চণ্ডীবাবুর সঙ্গে আলোচনার শেষে, আমরা সন্মাল গানের আসরে ফিরে গেলাম। ওখানে তখন মূলগায়নে বাসুদেব চক্রবর্তী দেব-দেবীর বন্দনায় বিভোর। আসরে উপস্থিত শ্রোতাদের অনেকেই তাই তন্ময়। কিছুক্ষণ পরে বন্দনা গানের শেষপর্বে, পূজকের সহকারী চণ্ডীবাবু তাঁর বামহাতে একগুচ্ছ কাঁড়োল মালা ও ডানহাতে একটি নতুন মাটির খুরিতে রক্তচন্দন নিয়ে, মন্দিরকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসরে উপস্থিত হলেন।

এখানে ঠাঁর আসবার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে জনৈক গ্রামবাসী বললেন—“এবার মালা-চন্দন হবে। তাই উনি এসেছেন। আমাদের দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামের নিয়ম হল, মালা-চন্দনের কাজ আরম্ভের সময়, গ্রাম তরফ থেকে চণ্ডীবাবুকে হুকুম নিতে হবে। গ্রাম-ষোল-আনার পক্ষ থেকেও শ্রবণ-দক্ষিণা স্বরূপ পাঁচশ পয়সা চণ্ডীবাবুর মাধ্যমে মূলগায়নকে দেওয়া হলে, তবেই তিনি ইচ্ছুক শ্রোতাদের মাথায় চামর বুলিয়ে ফেরির পয়সা

গ্রহণের অধিকারী হবেন। বলতে গেলে, এই ফেরির কাজ শূন্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজকের মত গানের আসরও শেষ। একটু পরে আপনারা সবকিছুই দেখতে পাবেন।”

### মালা-চন্দন

আমাদের কথাবার্তা শেষ হওয়ার কিছু পরেই, চণ্ডীবাবুকে মালা-চন্দন দেওয়ার কাজ শূন্য করতে দেখলাম। সর্বপ্রথমে উনি মূলগায়ের বাসুদেব চক্রবর্তীর হাতে যে কাল চামরাটি ছিল, তার হাতলে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে একটি কাঁড়োল মালা পরিয়ে দিলেন। এরপরে উনি দুটি খোল, একটি হারমোনিয়ম এবং কয়েকটি করতালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে মালাদান করে, মূলগায়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা ও গলায় একটি কাঁড়োল মালা পরিয়ে দিলেন। ঠিক এই অভিবাদনের প্রত্যুত্তরে, মূলগায়ের চণ্ডীবাবুকে প্রণাম করলেন। মূলগায়েরকে মালা-চন্দন করে, চণ্ডীবাবু দুজন খোলবাদক এবং করতালবাদকদের সামনে গিয়ে, একইভাবে তাঁদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, গলায় মালা দিলেন। মালা-চন্দনে সম্মানিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাও চণ্ডীবাবুকে একইভাবে পা-হুঁয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন।

গানের আসরে মালা-চন্দন দেওয়ার কাজ শেষ হলে, শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মালা-চন্দন দেওয়ার জন্য চণ্ডীবাবুকে এগিয়ে যেতে দেখলাম। উল্লেখ্য যে মালা-চন্দন গ্রহণ করে বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও চণ্ডীবাবুকে পা-হুঁয়ে প্রণাম করেছিলেন। পরিশেষে, গ্রাম-ষোল-আনার সম্মতিতে বিশেষ অতিথি হিসাবে আমরা ওখানে উপস্থিত থাকবার কারণে, আমাদেরও ঐ মালা-চন্দন পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। ঐ সময় চণ্ডীবাবু তাঁর ডানহাতের কনিষ্ঠা, অনামিকা ও বৃঙ্কাজ্জ্বলি একত্রে এনে চন্দন তুলে আমাদের কপালে ফোঁটা দিয়েছিলেন। শুনলাম, এইভাবে প্রত্যেককেই ফোঁটা দেওয়া হয়েছে এবং এটাই হল যথার্থ মালা-চন্দনের নিয়ম। মালা-চন্দনের কাজ শেষ হলে, চণ্ডীবাবু অসমাপ্ত গানের আসর ছেড়ে মন্দিরে ফিরে গেলেন। আমরাও ঠিকে অনুপরণ করে মন্দিরে গেলাম।

মন্দিরে এসে দেখলাম, ওখানে তখন হিমাংশুবাবু গ্রাম-ষোল-আনার পক্ষ থেকে নির্বাচিত রত্নী শচীনন্দন ভৌমিককে পদ্মপাঞ্জলির মন্ত্র আবৃত্তি করচ্ছেন। আমাদের ঘড়িতে তখন রাত দুটো বেজে চাঁদ্রশ মিনিট। পদ্মপাঞ্জলির কাজ শেষ করে হিমাংশুবাবু আমাদের বললেন, “ইতিমধ্যে পদ্মপাঞ্জলির কাজ শেষ হলেও, আরতি ও মায়ের ভোগ নিবেদনের কাজ কিছু শেষ হয়নি। ভোগ রান্নার কাজ মিটেতে প্রায় ভোর হয়ে যাবে। ওদিকে গানের আসরে মূলগায়ের এখনও গান চালিয়ে যাচ্ছেন। দর্শকেরাও তো একমনে গান শুনছেন।”

## মন্দিরে পূজার বিবরণ

কথাপ্রসঙ্গে একটু আগেই হিমাংশুবাবুর মূখে শুনোঁছিলাম যে, এখনকার মত তিনি পূজার কাজ শেষ করেছেন। তাই এই অবসরে আজ সন্ধ্যায় মন্দিরকক্ষে পূজা আরম্ভের পর থেকে পূজার সমাপ্তি পর্যন্ত তাঁকে পর পর যে সকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া পালন করতে হয়েছে, সে সম্পর্কে তাঁকে বলবার জন্য অনুরোধ করলাম। আমাদের এই অনুরোধ শূনে উনি প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করলেও পরে সন্মত হলেন। তারপর একটু চিন্তা করে বললেন,

“ইতিমধ্যে চণ্ডীবাবুর কাছে আজকের পূজা সম্পর্কে আপনারা তো শুনেনছেন। আমি তখন পূজার কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তাই কথা বলা সম্ভব হয়নি। যাইহোক, এখন ষেটা জানতে চাইছেন, মানে পূজার ব্যাপারটা, তা বলাছি। প্রয়োজনবোধে লিখে নিতে পারেন। এগুন্টালি পর পর হল এরকম—

- (১) আচমন
- (২) তিলক ধারণ
- (৩) শিখা বন্ধন
- (৪) সামান্যার্ঘ্য ( জলশর্দূক )
- (৫) পুষ্পশর্দূক
- (৬) আসনশর্দূক
- (৭) গায়ত্রী পাঠ
- (৮) অঙ্কন্যাস
- (৯) মাতৃকান্যাস
- (১০) অন্তর মাতৃকান্যাস
- (১১) বাহ্য মাতৃকান্যাস
- (১২) পিঠন্যাস
- (১৩) প্রাণায়াম
- (১৪) দেবতা স্নান
- (১৫) গন্ধ দান
- (১৬) দেবীর গায়ত্রী
- (১৭) গুরু পূজা
- (১৮) পঞ্চ দেবতার পূজা—অর্থাৎ, গণেশ-সূর্য-বিষ্ণু-শিব ও দুর্গার পূজা
- (১৯) মূল দেবতার পূজা ( এক্ষেত্রে দেবী শীতলার পূজা )
- (২০) ঔবেদ্য নিবেদন
- (২১) ভোগ-রাগ ও
- (২২) জপ-তর্পণ।

এটুকু জেনে রাখুন, পূজার বসবার পরে একের পর এক যে যে ক্রিয়া

পালন করতে হয়, দীর্ঘদিনের অভ্যাসের ফলে, ঠিকই তা হয়ে যায়। এটাইতো আমাদের কাজ। তবে আপনারা যেভাবে জানতে চাইছেন, সেভাবে পর পর বলতে গেলে হয়ত আগের কাজটা পরে বলা হয়ে যেতেও পারে। তাছাড়া, শাস্ত্রমতে এমন কিছু গৃহ্য প্রক্রিয়া আছে, যেগুলো সর্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করা অনর্দিত। কোন গ্রন্থেও সেগুলো নির্দিষ্টভাবে বাচক দিলে বলা নেই। যাইহোক, পরে সম্ভবত এগুলি একবার আমার কাছে মিলিয়ে নেবেন। কিছু গরমিল থাকলে তখন সংশোধন হয়ে যাবে।”

### আসর ফেরি

হিমাংশুদেবের সঙ্গে আলোচনার শেষে আমরা গানের আসরে ফিরে গেলাম। কারণ, ঊরু কথামত মূলগায়নে এখনই হয়ত ‘আসর ফেরি’ শব্দ রু করবেন। আমাদের ওখানে উপস্থিত হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মূলগায়নে বাসুদেব চক্রবর্তী তাঁর ডানহাতে চামর নিয়ে আসর থেকে বেরিয়ে, শ্রোতাদের মধ্যে এগিয়ে গেলেন। তখনও কিন্তু তাঁর দলের লোকেরা আসরে গান করছিলেন। বাসুদেব প্রথমে মেয়েদের কাছে গেলেন। গ্রামের প্রচলিত নিয়মে, মহিলা ও পুরুষদের বসবার জন্য এখানে পৃথক পৃথক স্থান নির্দিষ্ট থাকে। যাইহোক, মেয়েদের সামনে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, অনেকেই তাঁকে ভক্তিরে প্রণাম করে সাধ্যমত প্রণামী দিতে লাগলেন। মূলগায়নে তখন তাঁদের মাথায় সন্নেহে চামর বুলিয়ে আশীর্বাদ করছিলেন। সন্তান-কালে মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই। তিনি একইভাবে পুরুষদের সীমানায় আসবার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁদের মধ্যেও চামরের স্পর্শ পাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি শব্দ হল। মূলগায়নকে প্রণাম করে, প্রণামী পয়সা দিখে অনেকের শ্রদ্ধা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উনিও তাঁদের প্রত্যেকের মাথায় চামর বুলিয়ে আশীর্বাদ করছিলেন।

এই অবসরে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে জনৈক গ্রামবাসী জানালেন—  
“মায়ের এই সয়াল পূজায় যিনি মূলগায়নে, বলতে গেলে প্রত্যক্ষভাবে তিনিই তো শীতলা! তাই মায়ের হাতের চামরের স্পর্শ ও আশীর্বাদ পাওয়া তো আমাদের মত পাপী-তাপীদের জীবনে পরম সৌভাগ্য। তাছাড়া, আমাদের মধ্যে যারা অস্বাক্ষণ—তাঁদের পক্ষে তো আর যদিও গিয়ে মা শীতলাকে স্পর্শ করা সম্ভব নয়। তাই সয়াল পূজার সময়, মা শীতলাই মূলগায়নের ছদ্মবেশে আমাদের আশা পূর্ণ করেন। আর এই আসর ফেরি কথটার মূল তাৎপর্য হল—যেহেতু তিনি আসর থেকে বাইরে এসে শ্রোতাদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে অঃবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মাথায় চামর বুলিয়ে আশীর্বাদ করে থাকেন, তাই আমরা বলি আসর ফেরি। তবে অনেকে আবার ফেরিও বলে থাকেন।”

ইতিমধ্যে আসর ফেরি অন্তর্ধানটি শেষ হলে, মূলগায়নকে শীতলা:

মন্দিরের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলাম। ঐ সময় তাঁর দলের লোকেরা কিছু গান করছিলেন। জনৈক গ্রামবাসীর মধ্যে শুনলাম যে, আজকের জন্য নির্দিষ্ট গানগুলি শেষ হওয়ার পরেই মূলগায়ের আসর ফেরি করতে যাবে। এখন আসরে বসে তাঁর দলের লোকেরা যে গান গাইছেন, তাকে বলে মঙ্গল গান। এই গানের মাধ্যমে তাঁরা গ্রামবাসীদের মঙ্গল কামনা করছেন।

মূলগায়ের শীতলা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হতে দেখে আমরাও তাঁকে অনুসরণ করে মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়লাম। ইতিমধ্যে তিনি মন্দিরকক্ষের সামনে দেবী শীতলার মূর্তির মূখোমুখি দাঁড়িয়ে গায়ের সঙ্গীতের জন্য চামর ব্যজন শুরু করেছেন। ঐ সময় তাঁর ব্যজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, আসর থেকে বিশেষ বাজনা শুরু হল। এইভাবে কিছুক্ষণ চামর ব্যজন করে মূলগায়ের তাঁর হাতের চামরটি নিয়ে হাট্ট দাঁড়ির উপর উঠ দিয়ে বসে—দেবী শীতলার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন। প্রণামের শেষে, তিনি পুনরায় গানের আসরে ফিরে গেলেন।

মূলগায়ের যখন চামর ব্যজন শেষ করে প্রণাম করছিলেন, ঠিক তখনই দর্শকেরা আসর থেকে সমবেত কণ্ঠে প্রথমে ‘শীতলা মায়ের পদপদ্মে স্মরণ করে হরি-হর বল হরিবোল’ এবং তার পরেই ‘নিতাই গৌর প্রেমানন্দ হরি-হরি বল হরিবোল’—ধ্বনি দিয়ে আসর শেষ করলেন। আসর শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেবল গানের দলের লোকেরাই নয়, শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই কপালের উপর করজোড়ে হাত ঠেকিয়ে, শীতলা মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন।

ঐ সময় মূলগায়ের বাসুদেববাবু যখন তাঁর দলের লোকের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমরা তখন তাঁর কাছে আজ সন্ধ্যার পরিবেশিত গানের বিষয়বস্তু জানতে চাইলাম। উনি বললেন—

“আপনারা তো সেই সন্ধ্যা থেকেই সবকিছু দেখছেন। টেপ-মোসিনে আমাদের গান-টানও তুলেছেন। তা হলেও, আপনারা যখন দয়া করে আমার কাছে জানতে চাইছেন, তখন বলি—আজ আমরা প্রথমে পঞ্চদেবতার বন্দনা দিয়ে শুরু করেছি। তারপর সর্ব দেব দেবীর বন্দনা ও স্তুতিপাঠ করতে হয়েছে। এসব কাজ মিটিয়ে বেশ কিছুটা সময় ‘স্তুতিপতন’ বা পৃথিবীর সৃজন-বৃত্তান্ত সম্পর্কেও গান করেছি।”

আমাদের আলোচনার সময় জনৈক গ্রাম-প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি আমাদের কথায় বাধা দিয়ে বললেন—“এতক্ষণ তো আপনারা এঁদের গান রেকর্ড করলেন। তাই আমার অনুরোধ, ঐ রেকর্ডটা একটু শুনতে পেলো গায়কেরাও সখী হতেন।”

ওঁর এই অনুরোধে কেবল গানের দলের লোকেরাই নয়, ওখানে উপস্থিত গ্রামবাসীরাও আমাদের টেপ-রেকর্ড বাজিয়ে শোনানোর দাবি জানালেন। স্বাইহোক, আমাদের রেকর্ড করা অনুরোধের কিছুটা অংশ বাজিয়ে

শোনানোর ফলে, সকলেই খুব আনন্দ পেলেন। মনে হল; গ্রামবাসীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এই প্রথম টেপ-রেকর্ড শোনবার অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। আমাদের ঘড়িতে তখন রাত ৩টা-১২ মিনিট।

ঐ সময় জনৈক গ্রামবাসী আমাদের প্রসাদ খেতে যাওয়ার জন্য ডাকতে এলেন তাই মূলগায়নের কাছে বিদায় নিয়ে, আমরা মন্দিরসংলগ্ন মাঠে প্রসাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। প্রসাদ দেওয়ার পূর্বে ঐ জনৈক গ্রামবাসী আমাদের হাত-ধোয়ার জল দিলেন। তারপর কিছুটা কলাপাতার উপর মায়ের প্রসাদস্বরূপ ফল-মূল-মিষ্টি পরিবেশিত হল। প্রসাদ গ্রহণের শেষে 'প্রসাদী হাত' ধোয়ার জন্য পুনরায় আমাদের কিছুটা জল দেওয়ার সময় জনৈক গ্রামবাসীর মূখে শুনলাম যে, মন্দিরের সীমানার মধ্যে প্রত্যেককেই এসব নিয়ম মেনে চলতে হয়। উল্লেখ্য যে, কেবল আমাদেরই নয়, বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা, গ্রামবাসী ও ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরও প্রসাদ দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য ঢাকী ও কাঁসর ঘণ্টাবাদক এবটু দুরূহ বসে প্রসাদ খেয়ে ছিলেন।

প্রসাদ বিতরণের শেষে, মায়ের ভোগ নিবেদনের ব্যবস্থার জন্য চণ্ডীবাড়ী মন্দিরকক্ষে ফিরে গেলেন। ঐ সময় ঐ জনৈক কর্মকর্তা আমাদের বললেন— “আপনারা শুনছেন কিনা জানি না, সচরাচর আমাদের গ্রামের মাকে রাত্রিকালে অন্নভোগ দেওয়া হয় না। প্রতিদিন দুপুরেই তাঁকে অন্নভোগ দেওয়া হয়। অন্নভোগের সঙ্গে একটু মাছের ব্যবস্থা থাকেই। তবে আমাদের মায়ের কাছে যেহেতু কোন পশুবলির প্রথা নেই, তাই অন্নভোগের সঙ্গে মাংস দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। মায়ের এই দেশপূজার সময় সারাদিনই ব্রাহ্মণরা নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাই হয়ত আজ দুপুরে মাকে অন্নভোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমি অবশ্য অন্য কোন কারণ আছে কিনা, আপনাদের বলতে পারব না। শুনছি, চণ্ডীঠাকুরের বাড়ীর লোকেরাই ভোগ রান্না করছেন। এতক্ষণে হয়ত ভোগ রান্নার কাজ মিটে গেছে।”

### মায়ের অন্নভোগ

আমাদের এই আলোচনার কিছুক্ষণ পরেই, মন্দিরকক্ষে এবং মন্দিরকক্ষের বাইরে জল ছড়ানো হল। এরপর শীতলা মন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত ভোগ ঘর থেকে একের পর এক রান্না করা ভোগসামগ্রী এনে মন্দিরকক্ষে রাখতে দেখলাম। হিমাংশুবাড়ী বললেন—“এখানে যে দুটি পৃথক পৃথক থালায় অন্নভোগ পরিবেশিত হয়েছে, তার একটি হল দেবী শীতলার এবং অপরটি ঘণ্টাবর্ণদেবসহ সর্বদেবতার।” মন্দিরকক্ষে এই থালাগুলি এমনভাবে রাখা ছিল যে, সেগুলিতে যেন মায়ের সিংহাসন অথবা সদ্য—প্রতিষ্ঠিত জলঘটের সঙ্গে কোনভাবে ছোঁয়া না লাগে। এরপর হিমাংশুবাড়ী পূজার আসনে বসে ভোগ নিবেদনের কাজ শুরু করলেন। ঐ সময় তাঁকে মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে ভোগের থালায় ফুল অর্পণ করতে দেখলাম। ভোগ

নিবেদনপর্ব সম্পন্ন হলে, তিনি আরতির উপকরণগুলিকে গন্ধিয়ে নিয়ে স্থানহাতে জ্বলন্ত পঞ্চপ্রদীপ ও বামহাতে পূজার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে পূর্বমুখে দাঁড়িয়ে আরতি শুরু করলেন।

## আরতি

শীতলা মন্দিরে আরতি শুরুর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ঢাকী একটু দূরে দাঁড়িয়ে আরতির বাজনা বাজাতে লাগল। ঐ সময় একটি ছোট ছেলেকে ঢাকের তালে তালে কাঁসি বাজিয়ে তাল দিতে দেখলাম। এছাড়া শীতলা মন্দিরের দালানে দাঁড়িয়ে কয়েকজন ভক্ত কাঁসর, ঘণ্টা ও শাখ বাজানোর ফলে ভোররাতের নিজস্ব ভেঙে সেই শব্দ দূরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। মন্দিরকক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, পূজক হিমাংশুবাবু একটি প্রদীপ্ত পঞ্চপ্রদীপ তাঁর ডানহাতে এবং একটি ঘণ্টা বাম হাতে ধরে আরতি করছেন। আরতির অঙ্গ হিসাবে তিনি প্রতিমার বিভিন্ন অংশে এবং ঘটগুলির উদ্দেশ্যেও আরতি নিবেদন করছিলেন। উল্লেখ্য যে, এই দুটি ঘণ্টার মধ্যে একটি হল ঘণ্টাকর্ণের এবং অপরটি শীতলার। পঞ্চপ্রদীপ ছাড়াও তিনি পাণিশখ, নতুন গামছা, পঞ্চপল্লব, ফুল, বেলপাতা, ধূপ, চামর ও দর্পণ সহকারে পর পর আরতি করছিলেন। আরতি নিবেদনের কাজ শেষ হলে, হিমাংশুবাবু কুমির মাধ্যমে কোষা থেকে কিছুটা জল নিয়ে, মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে জ্বলন্ত পঞ্চপ্রদীপের উপর ঢেলে দিলেন। ওঁদিকে ওঁর হাতের ঘণ্টার শব্দ থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ও অপরাপর বাদ্যগুলিও থেমে গেল। এরপর ওখানে উপস্থিত সকলেই মন্দিরের দালানে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। ওঁরা সকলেই এখন প্রণামে নিমগ্ন, ঠিক সেইসময় হিমাংশুবাবু মন্দিরকক্ষের বাইরে এসে ভক্তবৃন্দের মাথায় তিনবার শান্তিজল ছিড়িয়ে, পুনরায় মন্দিরকক্ষে ফিরে গেলেন।

একটু পরে চণ্ডীবাবুর সঙ্গে দেখা হলে উনি বললেন—“আজকের মত পূজার কাজ শেষ হল। তবে আমার এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। মন্দির থেকে ভোগের খালা সরানো, ভোগ বিতরণের ব্যবস্থা, তারপর এটা সেটা তো আছেই। সুতরাং আমার এখন কথা বলার সময় হবে না। একটু পরেই হিমাংশুবাবু মন্দিরের কাজ মিটিয়ে বাইরে আসবেন। আপনারা কিছু জানবার থাকলে ওনার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।”

কিছুক্ষণের মধ্যে হিমাংশুবাবু মন্দিরকক্ষের বাইরে এলে, তাঁকে খুব পরিপ্রাপ্ত মনে হল। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন—“আপনারা ঠিকই লক্ষ্য করেছেন। যে চামরটি নিয়ে আমি আরতি করেছিলাম, সেটি কীকতু মূলগায়নের। গানের শেষে ঐ চামরটি উনি মায়ের মন্দিরে রেখে গেছেন। বলতে গেলে, এটা আমাদের গ্রামের নিয়ম। শূধু তাই নয়, এই সন্ধ্যা পূজার সময় প্রতিদিন সকালে, বিকালে ও রাতে প্রধান গান আরম্ভের পূর্বে, মূলগায়নেই মন্দিরকক্ষ থেকে চামরটি নিয়ে আসরে

বৃষতে হবে। ঔর কতব্য হল গানের শেষে, মন্দিরকক্ষে মায়ের সামনে চামরটি রেখে যাওয়া।”

### প্রসাদ বিতরণ

আমাদের এই কথাবাতার সময় জনৈক গ্রাম-প্রতিনিধি এসে জানালেন—  
“অনেক রাত হয়েছে। এবার আপনারা আমার সঙ্গে দয়া করে হারাধন আদকের বাড়িতে চলুন। গ্রামের তরফ থেকে ওখানেই আপনাদের জন্য ভোগ পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে।”

হারাধনবাবুর বাড়ি শীতলা মন্দিরের পশ্চিমে। আমরা ওখানে পৌঁছানোর পরেই মায়ের অন্নভোগ এসে গেল। প্রসাদ খেয়ে উঠতে না উঠতেই ভোর। আবার একটি নতুন দিনের জন্মত্রয়। দেবী শীতলার সয়াল পূজাকে কেন্দ্র করে আরও কত বিচিত্র অনুষ্ঠান!

কিছুক্ষণ পরে বচ্ছাতিকে আসতে দেখে, আমরা মন্দিরের দালান থেকে নেমে, মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়ে দাঁড়ালাম। বচ্ছাতি এসে মন্দির পরিষ্কারের কাজে লাগলেন। উনি সামনের পুকুর থেকে জল এনে ঝাঁটা দিয়ে মন্দিরের দালানটি প্রথমে পরিষ্কার করলেন। তারপর মন্দিরকক্ষটি পরিষ্কার করে, পূজার বাসনপত্র নিয়ে, পুকুরঘাটে ধুতে গেলেন। মন্দির পরিষ্কারের কাজ শেষ হলে, উনি বাড়ি ফিরে গেলেন।

ইতিমধ্যে শীতলা মন্দিরের পূজক হিমাংশুবাবু ওখানে উপস্থিত হলেন। ঔর কাছে বচ্ছাতির পরিচয় জানতে চাইলে উনি বললেন—  
“প্রতিদিন মন্দির পরিষ্কারের প্রয়োজনে গ্রাম-ষোল-আনার মত নিয়েই এই গ্রামের বিষ্ণুপদ দাসকে বচ্ছাতির কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। তবে বিষ্ণুপদ দাসকে এই কাজের ভার দেওয়া হলেও, বাস্তবে ঔর বাড়ির মেয়েরাই বচ্ছাতির কাজ করে থাকেন। আজ সকালে যিনি মন্দির পরিষ্কার করেছেন, তিনি হলেন বিষ্ণুপদের মা। ঔর নাম—দৈবকী দাসী।”

বচ্ছাতির প্রসঙ্গ শেষ হতেই, হিমাংশুবাবু আমাদের কাছে জানতে চাইলেন—গতকাল রাতে যখন আমাদের ঘুম হয়নি, তখন কেন আমরা এত সকাল সকাল এখানে এসেছি। হিমাংশুবাবুর প্রশ্নের উত্তরে আমরা

বললাম—“একটু পরেই তো মায়ের কাছে বারীগান আরম্ভ হবে। তাই আমরা সেই গান শুনতে এসেছি। গতকাল একজন গ্রামবাসীর মুখে শুনিয়েছিলাম যে, সন্ধ্যা পূজার কয়েকদিন মূলগায়নের দলের লোকেরা সকালে ও বিকালে মায়ের মন্দিরের সামনে বারীগান গেয়ে থাকেন। কিন্তু এখনও তো তাঁরা গান আরম্ভ করলেন না!”

আমাদের কথা শুনে হিমাংশুবাৰু কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন—  
 “কিছু মনে করবেন না। যিনি আপনাদের ঐ সংবাদটি দিয়েছিলেন, তিনি ভুল বলেছেন। আমাদের গ্রামের নিয়ম হল—পূজার দ্বিতীয় দিন সকালে ও বিকালে গায়কদলের বিশ্রাম; তবে আজ রাতে কিন্তু ৬’রা গাইতে আসবেন। যাইহোক, এখন আমাকে মন্দিরে যেতে হবে।”

### নিত্যপূজা

হিমাংশুবাৰু মন্দিরকক্ষে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আমরা মন্দিরকক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, উনি তখন ‘নিত্যপূজার আয়োজনে ব্যস্ত। এই মাঝে উনি যেটুকু বলেছিলেন, তা হল—

“এই গ্রামের শীতলা মন্দিরে সূর্যোদয়ের পূর্বে ‘মঙ্গল আরতি’র কোন প্রথা নেই। তবে প্রতিদিন সকালে নিত্যপূজা করতেই হয়। নিত্যপূজার পরে মাছের তরকারি দিয়ে অন্নভোগ দেওয়ার প্রথা বহুদিনের। মায়ের সন্ধ্যা পূজা উপলক্ষে, নিত্যপূজার সময় আরও কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে হয়। যেমন, পূজার দ্বিতীয় দিন থেকে শুরুর করে অষ্টমঙ্গলার দিন পর্যন্ত—সর্বমোট এই আটদিন, নিত্যপূজার পূর্বে অর্থাৎ সকালে পূজা আরম্ভের প্রাক্কালে, দেবী শীতলাকে ‘দত্তকাষ্ঠ’ দানের বিধি আছে। এই কারণে, পূজার উপকরণে বেলগাছের ছোট এক টুকরো কাঠ ও গরম জলের ব্যবস্থা থাকে। একইভাবে পূজার চতুর্থ দিন দেবী শীতলার সঙ্গে ঘণ্টাকর্ণ দেবের আনুষ্ঠানিক বিবাহ উপলক্ষে কেবল ভোগ নিবেদনের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র অনুষ্ঠানটির মধ্যেও নানান বৈচিত্রের সন্ধান পাবেন। সেগুলো দেখবার জন্যেই তো আপনারা এসেছেন।”

নিত্যপূজার সূচনায়, হিমাংশুবাৰু শীতলার পুকুর থেকে ঘটিতে জল ভরে এনে পূজার আসনে বসলেন। ঐ সময় তাঁর মূখ ছিল পূর্বদিকে। অবশ্য একটু আগেই চণ্ডীবাৰু এসে হিমাংশুবাৰুর কাছে নানাভাবে সহায়তা করছিলেন। পূজাস্থলে গত রাতে প্রতিষ্ঠিত শীতলা ও ঘণ্টাকর্ণের জল ঘট দুটির সামনে পূজার নৈবেদ্য, ফলমূল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি পৃথক পৃথক পাত্রে সাজানো ছিল। পূজা আরম্ভের পূর্বে হিমাংশুবাৰু তাঁর সামনে রাখা ফুল-বেলপাতা-দুর্বা-চন্দন ইত্যাদি উপকরণগুলিকে নিজের সন্নিবিধামত সাজিয়ে নিয়ে, ধূপ-দীপ জেতলে দিলেন। তারপর পুকুর থেকে ভরে আনা কিছুটা জল কোশায় ঢেলে, যথানিয়মে পূজা শুরুর করলেন। উল্লেখ্য যে, মন্দিরকক্ষে পূজার সময় কখন যে হিমাংশুবাৰু কোন বিশেষ ক্রিয়াটি

পালন করতেন অথবা কোন্ দেবতার ধ্যান মন্ত্র ও জপে নিবশ্ট আছেন—  
 দূর থেকে আমাদের পক্ষে তা অনুধাবণ করা সম্ভব হয়নি। তাঁর পূজার  
 শূন্য থেকেই ঢাকী ও কাঁসবাদকেরা মন্দিরের সামনে উপস্থিত ছিলেন।  
 শূন্য তাই নয়, মন্দির কক্ষে পূজার সময় হিমাংশুবাবু যখন মাঝেমাঝে পূজার  
 ঘণ্টা বাজাচ্ছিলেন, ঢাকীও ঠিক সেই সময় পূজার অঙ্গ হিসাবে বাজনা  
 বাজিয়ে, ঐ পূজার সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করছিলেন।

### ভোগ নিবেদন

হিমাংশুবাবু যখন নিবশ্ট মনে পূজা করছিলেন, সেই সময় মন্দিরসংলগ্ন  
 ভোগঘরে অন্নভোগ রান্নার প্রস্তুতি চোখে পড়ল। এর কিছূক্ষণ পরে  
 নিন্ত্যপূজার কাজ শেষ হলে, অন্নভোগ রান্নার কাজ শেষ হয়েছে কিনা  
 হিমাংশুবাবু জানতে চাইলেন। ওঁর প্রশ্নের জবাবে চণ্ডীবাবু বললেন—  
 “রান্নার খুব বেশী একটা দেবী নেই। ভোগ নিবেদনের ব্যবস্থা করতে করতে  
 রান্নার কাজ মিটে যাবে। ইতিমধ্যে আমি বরং ওগুলো সেয়ে ফেলি।”  
 এরপর চণ্ডীবাবু মন্দিরকক্ষে যেখানে ভোগের থালা রাখা হবে, সেই স্থানটি  
 জল ছিড়িয়ে পরিষ্কার করে, ভোগঘর থেকে ভোগের থালা আনতে গেলেন।  
 এর কিছূক্ষণ পরেই তাঁকে এষ্টপদে ভোগের থালা হাতে নিয়ে মন্দিরকক্ষে  
 প্রবেশ করতে দেখলাম। ভোগের থালা বসানোর সঙ্গে সঙ্গে হিমাংশুবাবু  
 যথানিয়মে ভোগ নিবেদন শূন্য করলেন। ভোগ নিবেদনের সময় তাঁকে  
 ভোগের থালার উপর মন্ত্রপাঠের মাধ্যমে ফুল-জল ছড়াতে দেখলাম। ভোগ  
 নিবেদনের কাজ মিটিয়ে, হিমাংশুবাবু তাঁর ডানহাতে ধরা পশুপ্রদীপের  
 বাতিগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে, বামহাতে পূজার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে  
 পূর্বমুখে উঠে দাঁড়ালেন। আরতির ঘণ্টা শূন্য, ঢাকীও আরতির বাজনা  
 বাজিয়ে চললেন। মন্দিরের দালানে দাঁড়িয়ে শাখ-কাঁসর ও ঘণ্টা রাজানোর  
 কাজেও কয়েকজন সক্রিয় হলেন। আরতির শেষে হিমাংশুবাবু মন্দিরকক্ষের  
 বাইরে এসে সমাগত ভক্তবৃন্দের মাথায় তিনবার শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন।  
 পূজার শেষে হিমাংশুবাবু আমাদের বললেন—“দেখলেন তো, নিন্ত্যপূজা  
 ও ভোগ নিবেদনের কাজ মেটাতেই প্রায় বিপ্রহর হয়ে গেল। এরপর  
 আবার রাত্রের কাজ আছে। বাইহোক, এখন আপনারা বরং বাসায় ফিরে  
 গিয়ে বিশ্রাম করুন। বিকেলের আগে আমাদেরও আর মন্দিরে আসতে  
 হবে না।”

### সন্ধ্যার অনুষ্ঠান

সন্ধ্যার একটু আগেই আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলাম। ওখানে  
 তখন ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ভিড়। শীতলা মন্দিরের দক্ষিণে সন্ন্যাস  
 পূজার জন্য নির্দিষ্ট একটি ভাঁড়ার ঘরের সামনে এসে দেখলাম, ওখানে  
 বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা নানা কাজে ব্যস্ত। ভাঁড়ারী চণ্ডীচরণ আদকের  
 সঙ্গেও দেখা হল। ওঁর মূখে শুনলাম, সন্ধ্যার সময় মন্দিরে যে আনুষ্ঠানিক

পূজার কাজ শুরুর হবে, উনি তার উপকরণগুলি সাজানোর কাজে ব্যস্ত  
 আছেন। ওঁদের কাজকর্ম দেখতে-দেখতেই পড়ত বিকেল অন্ধকারের রূপ  
 নিল। হ্যারিকেন লাইটের আলোতে সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণটি তখন  
 আলোকিত। এর একটু আগেই মন্দিরের বহুতিকে শীতলা মন্দিরে জল  
 ছিড়িয়ে প্রদীপ জ্বললে কাসির ঘণ্টা বাজিয়ে সন্ধ্যা দেখিয়ে, বাড়ি ফিরে যেতে  
 দেখলাম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার অব্যবহিত পরেই, পূজক হিমাংশুবাবু ও তাঁর  
 সহকারী চণ্ডীবাবু মন্দিরকক্ষে প্রবেশ করলেন। ওঁদের মূখে শুনলাম—  
 এই গ্রামের শীতলা মন্দিরে সন্ধ্যার সময় কোন আরাতি হয় না। তবে এই  
 সন্ধ্যা পূজার সময়, রাত্রিকালেও পূজা এবং আরাতির প্রথা আছে।  
 বাইহোক, একটু পরেই পূজা শুরুর হবে। তারপর আরাতি। আরাতি শেষ  
 হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই, মূলগায়ন এখন দেবী শীতলার জন্মবৃত্তান্ত  
 বা 'সৃষ্টিপত্তন' গানে অংশগ্রহণ করবেন—ঐ সময় তাঁরও মন্দিরে পূজার  
 মাধ্যমে সেই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। এতে পূজা ও গান একইসঙ্গে  
 শেষ হবে।

আমাদের সঙ্গে আলোচনার পরেই, হিমাংশুবাবু পূর্বমুখে বসে  
 সন্ধ্যাকালীন পূজার কাজ আরম্ভ করলেন। ঐ সময় চণ্ডীবাবু তাঁকে  
 প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করছিলেন। আমরা এখন ওখানে পূজা  
 দেখছিলাম, সেইসময় গানের আসর থেকে খোল-করতালের শব্দ কানে  
 এল। তাই আমরা ওখান থেকে গানের আসরে গেলাম।

### কীর্তন

গানের আসরে গিয়ে দেখলাম, ইতিমধ্যে দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামের  
 কীর্তন দলের বেশ কয়েকজন গায়ক ও বাদক ওখানে উপস্থিত হয়েছেন।  
 গতকাল রাতে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হরনি, আজ তাঁদের দেখা পেলাম।  
 কথাপ্রসঙ্গে তাঁদের মধ্যে একজন বললেন—“আমাদের এই দক্ষিণ নারকেলদা  
 গ্রামের নিয়ম হল, সন্ধ্যার পরে গ্রামের দলের পক্ষ থেকেই মা-কে প্রথমে  
 কীর্তন শোনানো হবে। আমাদের গান শেষ হলে, বাহরাগত মূলগায়নের  
 দলের লোকেরা সন্ধ্যা গান শুরুর করবেন।” একটু পরে ওঁরা এখন গান  
 আরম্ভ করলেন, তখন ধীরে ধীরে আসরে ভিড় বাড়তে লাগল।

### আরাতি

বেশ কিছুক্ষণ আসরে বসে কীর্তন শোনবার পরে, মন্দির থেকে কাসির,  
 ঘণ্টা, শাখ ও ঢাকের শব্দ কানে এল। তাই আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে,  
 মন্দিরে আরাতি দেখতে গেলাম। মন্দিরকক্ষের বাইরে থেকে দেখলাম—  
 হিমাংশুবাবু তখন পূর্বমুখে দাঁড়িয়ে পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে তন্ময়ভাবে আরাতি  
 করছেন। ঐ সময় উনি দেবী শীতলার পিতলের মূর্তিটি ছাড়াও,

পূজাস্থলে স্থাপিত ঘণ্টাকর্ণ ও শীতলার ঘট দ্বটিকেও আরাতি করলেন। পঞ্চপ্রদীপ সহকারে আরাতির শেষে, উনি ঐ প্রদীপটিকে মেঝেতে নামিয়ে রাখলেন। এরপর তামার কুঁষিপায়ে কোষা থেকে একটু জল নিয়ে আরাতি শূন্য করলেন। এভাবে আরাতির শেষে ঐ কুঁষিটিকে কোষার একপ্রান্তে রেখে—দুটি ধূপকাঠি জ্বললে ফুল-জল দিয়ে শোধন করে, পুনরায় আরাতি করতে লাগলেন। ধূপ দিয়ে আরাতি করে ওগুনালি মেঝেতে রেখে, পুনরায় কোষা থেকে কুঁষিপায়ে জল নিয়ে আরাতি করলেন। আরাতির শেষে কুঁষিটিকে আগের মতই কোষার একপ্রান্তে রেখে, ইতিপূর্বে নিবোধিত সেই পঞ্চপ্রদীপের একটি জ্বলন্ত বাতির একপ্রান্ত আঙুলের মাধ্যমে ধরে, প্রথমে তাঁর পূজার আসনের চতুর্দিকে ঘুরিয়ে, পরে আরাতির মূদ্রায় হাত বোরাতে লাগলেন। এভাবে আরাতির শেষে, তিনি ঐ বাতিটিকে পঞ্চপ্রদীপের উপর স্থাপন করে, কোষা থেকে কুঁষিতে কিছুটা জল নিয়ে পঞ্চপ্রদীপের উপর ছিটিয়ে দিলেন। এইভাবে আরাতির কাজ শেষ হল। উল্লেখ্য যে, আরাতির ঘণ্টা থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এতক্ষণ যারা ঢাক, কাঁসর, শাখ ও ঘণ্টা বাজিয়ে সহায়তা করাছিলেন, তাঁরাও বাজনা বন্ধ করলেন। ঐ সময় হিমাংশুদেব মন্দিরকক্ষের বাইরে এসে প্রণামরত ভক্তদের মাথায় পর পর তিনবার শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন। আরাতির শেষেও সমগ্র মন্দিরকক্ষটি ধূপ-ধূনার গন্ধে সুরাভিত হয়ে রইল।

এর পরে আমরা যখন হিমাংশুদেবের সঙ্গে কথা বলবার জন্য অপেক্ষা করছি, তখন জনৈক গ্রাম প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ হল। কথাপ্রসঙ্গে জানতে পারলাম যে, আরাতি শেষ হওয়ার পূর্বেই গ্রামের দলের কীর্তন গায়কেরা গান বন্ধ করেছেন। কারণ, যেহেতু গতকাল আসর ভাঙতে অনেক রাতি হয়েছে, তাই আজ গ্রামবাসীদের অনুরোধে সয়াল গানের বা পাঁচাল গানের দলের লোকেরা কিছুক্ষণ আগেই গাইতে এসেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই গ্রামের দলের লোকেরা সানন্দেই তাঁদের কীর্তন বন্ধ করেছেন।

### সয়াল গান

মন্দিরকক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের এই আলোচনার সময়, সয়াল গানের দলের পক্ষ থেকে ভীমাচরণ মাস্তা একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরের দালানে এসে দাঁড়ালেন। ওঁদের দেখে চণ্ডীবাবু মন্দিরকক্ষ থেকে একটি কালো চামর এনে ভীমবাবুর হাতে তুলে দিলেন। উনি ঐ চামরটিকে ভক্তিরে দ্ব-হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করে, পূর্বমুখে হাঁটু গেড়ে বসে মেঝের উপর মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। ভীমবাবুর মুখে শুনছিলাম যে, সয়াল গান আরম্ভের পূর্বে ঐ চামর নিয়ে প্রণামের অর্থ হল—দেবী শীতলার কাছে প্রার্থনা করা। যাতে গানের আসরে কোন বাধার সম্মুখীন হতে না হয় এবং আসরে উপস্থিত সকলেই আনন্দ লাভ করতে পারেন। মন্দিরে প্রণাম করে ভীমবাবু তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে আসরে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে

সঙ্গে, আমরাও মন্দির থেকে ধীরে আসরে গেলাম ।

আসরে এসে দেখলাম—সরলা গানের দলের লোকেরা তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট বেদীর উপর আসন বিছিয়ে বলেছেন । তাঁরা তাঁদের বাদ্য-বন্দগুলিকে আসরের দ্বাধারে উত্তর-দক্ষিণে সাজিয়ে, নিজেরা পূর্ব-পশ্চিমে মূখ্যমুখি বসে গ্রাম-ভরস্কের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছেন । মন্দির থেকে চামরটি এনে ভীমবাবু তাঁদের সামনে উত্তর মুখে হাট্টু গেড়ে বসে, দেবী শীতলাকে প্রণাম করলেন । এরপর তাঁর গায়ের সাদা ওড়নাটি আসরে বিছিয়ে, সেই ওড়নার উপর চামরটি রেখে দিলেন । ঐ সময় চামরের হাতলটি ছিল দক্ষিণে ।

ইতিমধ্যে আসরে প্রচুর লোক সমাগম হওয়ার, গ্রামবাসীরা পরিচালক-মণ্ডলীর কাছে গান আরম্ভের অনুরোধ জানাতে লাগলেন । শ্রোতাদের শান্ত করবার জন্য তখন জনৈক ব্যক্তি আসরের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন— “দেখুন আমার অনুরোধ—আপনারা দয়া করে একটু শান্ত হোন । বিশেষ কোন কারণে মূলগায়েনমশাই এখনও উপস্থিত হতে পারেন নি । তাই গান আরম্ভ করতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে । আপনারা যদি না অমত করেন, তবে আমাদের দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামে যে সরলা গানের দলটি আছে, সেই দলের অন্যতম গায়ক হরিপদ মেট্যা মশায়কে আমরা এখনই গান আরম্ভের অনুমতি দিতে প্রস্তুত আছি । অবশ্য হরিপদবাবুর যদি না আপত্তি থাকে । তবে কথা হল, মূলগায়েন আসরে পৌঁছে গেলে, হরিপদবাবু কিন্তু তখনই তাঁর হাতে চামরটি সমর্পণ করবেন ।”

এই প্রস্তাবে কেবল গ্রামবাসীরাই নয়, যে সকল প্রতিনিধি ওখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও সানন্দে হরিপদবাবুকে গান আরম্ভের জন্য অনুরোধ জানালেন । বিহরাগত সরলা গানের দলের লোকেরাও এই প্রস্তাবসাদরে মেনে নিলেন । এইসময় কয়েকজন গ্রামবাসী কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, “যেহেতু মূলগায়েন মশাই মন্দির থেকে নিজে চামর না এনে, তাঁর দলের লোক মারফত চামর আনিয়েছেন এবং কথা সময়ে আসরে উপস্থিত হতে পারেন নি—তাই তাঁকে অবশ্যই কৈফিয়ত দিতে হবে ।”

এভাবে কিছু সময় অতিবাহিত হলে, হরিপদবাবু আসরে এসে প্রথমে শ্রোতাদের অভিবাদন জানালেন । তারপর উনি শীতলা মন্দিরের দিকে উত্তরমুখে বসে, চামরসহ ভক্তিভরে প্রণাম করে গান আরম্ভ করলেন । ওঁর স্থান আরম্ভের কিছুক্ষণের মধ্যেই মূলগায়েন বাসুদেব চক্রবর্তী এশ্রুপদে আসরে এসে উপস্থিত হয়ে মায়ের মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম জানালেন । এরপর উনি বন্দনা গানে রত হরিপদবাবুর হাত থেকে হস্তিতে চামরটি চেয়ে নিয়ে গান ধরলেন । চামরটি হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে, হরিপদবাবু ম্যাকে প্রণাম জানিয়ে গান বন্ধ করলেন ।

উল্লেখ্য যে মূলগায়েন আসরে গান আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে, শ্রোতাদের মধ্যে বেশ আনন্দের প্রকাশ চোখে পড়ল । পঞ্চদেবতার বন্দনা ও স্তুতিপাঠ

করবে করতেই কিছু সক্ষম জড়িতবাহিত হল। এরপর উনি চামর হাতে নিয়ে পেশাদারী ভঙ্গীতে শীতলা ও তাঁর সহকারী জ্বরাসুদের অলৌকিক সৃজনমাহাত্ম্য বর্ণনা ছাড়াও দেবী শীতলা কিভাবে তাঁর পূজার প্রচলনে সক্ষম হয়েছিলেন সেই বৃত্তান্তও শ্রোতাদের পরিবেশন করলেন।

মূলগায়নের এই বর্ণনার সংক্ষিপ্তসার এইরূপ : সৃষ্টির পরে দেবী শীতলা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে তাঁর পূজা পাওয়ার অভিলাষ প্রকাশ করতে : থাকায়, সহকারী জ্বরাসুদর প্রথমেই তাঁকে স্বর্গরাজ্যে অভিযানের পরামর্শ দেন। জ্বরাসুদের কথায় আশান্বিত হয়ে, গদ'ভ-বাহনে শীতলা প্রথমে স্বর্গরাজ্যে উপস্থিত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে পূজা পাওয়ার দাবী করেন। ও'র এই অসংগত দাবীর কথা শুনলে, দেবরাজ ইন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে তা বিদ্রুপের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলে, শীতলা খুবই অপমানিত বোধ করেন। এরই ফলশ্রুতি—দেবীর ক্রোধে স্বর্গে কাতি'ক-গণেশ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন। তখন শিব-দুর্গার মিলিত উদ্‌ঘোষে একে একে বরদূণ, যমসহ অপরাপর দেবগণের পক্ষ থেকেও, ষোড়শ উপচারে শীতলা পূজার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই প্রাতিশ্রুতির কথা শুনলে, করুণা-পরবশ হয়ে দেবী শীতলা কাতি'ক-গণেশকে রোগমুক্ত করেন। এভাবেই কাহিনী এগিয়ে চলে।

উল্লেখ্য যে, এই কাহিনী বিন্যাসের ফাঁকে ফাঁকে, মূলগায়নের সঙ্গীরা লোকপ্রিয় হাস্যরস ও কথকতার মাধ্যমে শ্রোতাদের পরিভূপ করছিলেন। বাস্তবে, পাঁচাল গানের স্বকীয় ঢং-এ পরিবেশিত এই অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনায়, স্বর্গের দেব দেবীদের চরিত্র এবং সেইসঙ্গে তাঁদের চিন্তা-ভাবনায় মানব চরিত্রের গুণাগুণ বর্তমান থাকায়, ঐ সকল চরিত্রের সঙ্গে শ্রোতারও একাত্ম হতে পেরেছিলেন।

আমরা যখন গানের আসরে বসে গান শুনছি, ঠিক সেই সময় জনৈক গ্রামবাসী আমাদের মন্দিরে যাওয়ার অনুরোধ জানালেন। ও'র সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে দেখলাম, তখনও হিমাংশুবাবু পূজার কাজে ব্যস্ত। আমাদের দেখে চণ্ডীবাবু সহাস্যে বললেন, “আপনারা তো পূজা দেখতে চেয়েছিলেন, তাই ডেকে পঠালাম। অবশ্য এই পূজায় দেখবার মত আর কি আছে বলুন? তাছাড়া, যেভাবে ধাপে ধাপে পূজার কাজ চলছে, সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কেউ না বন্ধিয়ে বললে, সমগ্র ব্যাপারটা একঘেয়ে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার পক্ষে সেটা তো আর সম্ভব নয়। এখন একটু দেখে নিন। কারণ, একটু পরেই তো পূজার কাজ শেষ হবে।”

চণ্ডীবাবুর কাছে জানতে চাইলাম—“এখন কিসের পূজা হচ্ছে?” আমাদের প্রশ্নের উত্তরে চণ্ডীবাবু বললেন—“সেই যখন থেকে মূলগায়নের আসরে সৃষ্টিপত্তন গান শুরুর করেছেন, সেইসময় থেকে মন্দিরে পূজার কাজও শুরুর হয়েছে। এই পূজার প্রধান অংশ হল—মায়ের জন্মাৎসব

পূজা । বলতে গেলে, ষষ্ঠী আদি দশবিধ সংস্কারগুলিকে নানাবিধ উপকরণ সহযোগে পূজা ও অর্চনার মাধ্যমে পালন করা । আমাদের গ্রামের নিয়ম হল—মন্দিরে যখন জ্যোৎস্না পূজার কাজ চলবে, মূলগায়ের তখন আসরে সৃষ্টিপত্তন সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে শ্রোতাদের তা অবহিত করাবেন । আপনারা তো এতক্ষণ গানের আসরে ছিলেন, তাই আমার বক্তব্য অবশ্যই অনুধাবন করতে পারছেন ।’’

আমাদের এই আলোচনার সময় জনৈক গ্রাম-প্রতিনিধি আসরে মালা-চন্দন দেওয়ার কাজে যাওয়ার জন্য, চণ্ডীবাবুকে প্রস্তুত হতে বললেন । কারণ, আজ নাকি একটু তাড়াতাড়ি গান শেষ হবে । আমরা এই সংবাদ পেয়ে চণ্ডীবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে, আসরে গিয়ে উপস্থিত হলাম ।

### মালা-চন্দন

আমরা গানের আসরে উপস্থিত হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই, চণ্ডীবাবু মালা-চন্দন হাতে নিয়ে আসরে এলেন । ওখানে এসে উনি প্রথমে মূলগায়ের হাতে ধরা চামরাটিতে চন্দনের ফোঁটা ও মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন । শব্দে তাই নয়, দুটি খোল, তিন জোড়া করতাল, একটি হারমোনিয়ম, একটি ঝুমঝুমি ও একটি বাঁশীর বাজে একইভাবে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে মালাদান করলেন । পরিশেষে তিনি মূলগায়ের কাছে এসে প্রথমে তাঁর কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে, গলায় একটি মালা পরিয়ে দিলেন । এই মালা-চন্দনের প্রত্যুত্তরে, মূলগায়েরও তাঁকে মালাদান করে তৃপ্ত হলেন । এরপর চণ্ডীবাবু বামদিক থেকে শব্দ করে পরপর বাঁদের মালা-চন্দন করলেন, তাঁরা হলেন—খোলবাদক, হারমোনিয়মবাদক, করতালবাদক, দোহারগণ ও ঝুমঝুমিবাদক । এই কাজের শেষে উনি মূলগায়ের হাতে শ্রবণ-দক্ষিণা স্বরূপ পঁচিশ পরসাদি দিয়ে আসরের বাইরে কয়েকজন গ্রাম্য-প্রতিনিধি ও ভদ্র প্রজাদের মালা-চন্দনে সম্মানিত করে মন্দিরে ফিরে গেলেন ।

### আসর ফেরি

মালা-চন্দন পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মূলগায়ের চামর হাতে উত্তর মূখে আসর থেকে নেমে এলেন । শুনলাম এবার উনি ‘আসর ফেরি’ করবেন । গানের আসরের পূর্বদিকে মহিলাদের জন্য যে পৃথক আসনের ব্যবস্থা ছিল, প্রথমে উনি সেই দিকে গেলেন । অবশ্য উনি ওখানে পৌঁছানোর পূর্বেই বেশ কয়েকজন মহিলা তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন । ওখানে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মহিলাদের মধ্যে অনেকেই মূলগায়ের হাতে ধরা চামরের স্পর্শ মাথায় নিয়ে তাঁর হাতে ফেরির প্রণামী পরসাদি দিয়ে ভক্তিতে পা-হুয়ে প্রণাম করছিলেন । ঐ সময় শিশু কোলে জননীদেব চামরের স্পর্শ লাভের জন্য বেশী উদগ্রীব বলে মনে হল । মহিলাদের মধ্যে ফেরির কাজ শেষ হলে, মূলগায়ের আসরের উত্তর দিকে অপেক্ষারত

পূর্ববদনের কাছে গেলেন। উনি যখন আসরে ফেরির কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ও'র দলের লোকেরা কিছু আসরে মতই গান করছিলেন। এভাবে ফেরির কাজ শেষ করে আসরে ফিরে যাওয়ার পরে উনি ঠিক পূর্বের মতই আবার গান ধরলেন।

আসরে কিছুক্ষণ গানের পর, একসময় মূলগায়নের উত্তর মূখে দাঁড়িয়ে চামর ব্যঞ্জন করে গান করতে লাগলেন। এরপর হঠাৎ গান বন্ধ করে শূন্যমাত্র চামর ব্যঞ্জন করতে লাগলেন। লক্ষণীয় যে, মূলগায়নের যখন গান থামিয়ে চামর ব্যঞ্জন করছিলেন, ও'র গানের দলের লোকেরাও তখন গান না গেলে চামর ব্যঞ্জনের তালে তালে বাদ্যযন্ত্রগুলি বাজাচ্ছিলেন। এই বিশেষ ঐকতানের পাশাপাশি মন্দির থেকে ঢাক-কাঁসর-ঘণ্টা ও শাঁখের শব্দে আরতির সঙ্কেত পেলাম। তাই আমরা আরতি দেখবার জন্য মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

আমরা যখন মন্দির কক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে আরতি দেখায় ব্যস্ত, সেইসময় মূলগায়নকেও ওখানে উপস্থিত হলেন। মন্দিরে আরতি চলাকালে উনিও চামর ব্যঞ্জন করছিলেন। আরতি শেষ হলে, মূলগায়নের চামর ব্যঞ্জন বন্ধ রেখে, অপরাপর ভক্তদের সঙ্গে মন্দিরের দালানে প্রণাম করলেন। এর ফলে, হিমাংশুবাবু যখন প্রণামরত ভক্তদের মাথার শান্তিজল ছড়াচ্ছিলেন, তখন মূলগায়নও শান্তিজল পেলেন। শান্তিজল নেওয়ার পরে তিনি তাঁর হাতের চামরাটি মন্দিরকক্ষে ব্রাহ্মণের হাতে দিয়ে, আসরে ফিরে গেলেন। দূর থেকে দেখলাম, আসরে তাঁর দলের লোকেরা তখন তাঁদের নিজ নিজ বাদ্যযন্ত্রগুলিকে গুঁছিয়ে রাখছেন। একজন বললেন, “আজকের মত গানের আসর শেষ হয়ে গেছে। তাই ও'রা এবার বাসায় ফিরে যাবেন। পূজা কমিটির পক্ষ থেকে সন্ধ্যা গানের দলের লোকদের জন্য থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য মূলগায়নের উপর দায়িত্ব দেওয়া আছে।”

পূজার কাজ শেষ করে হিমাংশুবাবু যখন মন্দিরকক্ষের বাইরে এলেন, তখন তাঁকে সত্যই ক্লান্ত মনে হল। রাতে অন্নভোগ কখন হবে জানতে চাইলে উনি বললেন—“আজ রাতে অন্নভোগের কোন প্রথা নেই। তাছাড়া, দুপুরে তো মাকে অন্নভোগ দেওয়া হয়েছে। রাতে ফল-মূল নৈবেদ্য দিয়েই শীতলা ও ঘণ্টাকর্ণ দেবের পূজা হয়েছে। যাইহোক, এসব আলোচনা এখন থাক। আপনারা তো চণ্ডীবাবুর কাছে কিছু কিছু শুনছেন। আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে যদি কিছু জানবার থাকে, তবে পরে জেনে নেবেন।” তখন রাত একটা বেজে দশ মিনিট।

### তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান

পূজার তৃতীয় দিন সকালে আমরা শীতলা মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলাম। গতকাল হিমাংশুবাবুর মূখে শুনছিলাম যে, পূজার তৃতীয় দিন

থেকে অন্তিমজলার পূর্বদিন শেষের মধ্যে রাষ্ট্রীয় উপলক্ষ্যে পূজা  
 আছে। তাই মূলগায়নে তাঁর দলের কয়েকজনকে নিয়ে সকালে ও বিকালে  
 মন্দিরসংলগ্ন আসরে বলে কিছুক্ষণ বারীগান করে থাকেন। এছাড়া, মায়ের  
 সয়াল পূজাকে কেন্দ্র করে যে সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়ে আসছে, সেগুণের  
 জন্য প্রয়োজনীয় গানগুণিও তাঁকে গাইতে হয়। সুতরাং মূলগায়নে  
 নির্বাচনের পূর্বে তাঁকে কোন কোন দেব-দেবীর গান গাইতে হবে তা  
 সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়। যদি কোন কারণে মূলগায়নের ঐ  
 গানগুণি না শেখা থাকে, তবে তিনি নিজেই অপর কোন গায়নের খোঁজ  
 করতে বলেন। যেহেতু এই সয়াল পূজার দিনগুণির বিস্তৃতি ও বিশেষভাবে  
 ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে প্রচলিত অনুষ্ঠান সমূহের মধ্যে গরমিলের সংখ্যাই অধিক,  
 সেই কারণে, ওঁদের মতে, উপযুক্ত গায়নে পাওয়া সত্যিই এক সমস্যা।

আমরা যখন মন্দিরের সামনে উপস্থিত হয়ে হিমংগুণবাবুর কথামত  
 বারীগান শোনার জন্য অপেক্ষা করছি, তখন জনৈক গ্রামবাসী আমাদের  
 মন্দিরের দালানে গিয়ে বসতে বললেন। শুনলাম, আমাদের ওখানে  
 পেঁছানোর পূর্বেই বহুটি মন্দির পরিষ্কার করে বাড়ি চলে গেছেন।  
 এঁদের গ্রামের নিয়ম হল—বারীগান শুরু হওয়ার পূর্বেই মন্দিরটি পরিষ্কার  
 করতে হবে। বারীগান শুরু হলে, মন্দিরের দরজাটি অবশ্যই খুলে রাখতে  
 হবে। এই আলোচনার সময়, বেশ কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আমাদের  
 সামনে এসে দাঁড়াল। এরপর আমরা ওখান থেকে মন্দিরের অদূরে ভাঁড়ার  
 ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। ওখানেই সয়াল পূজার ভাঁড়ারী চণ্ডীচরণ  
 আদ্যকের সঙ্গে দেখা হল। এই সাত সকালেই উনি তাঁর কাজ শুরু  
 করেছেন। কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রামবাসীকেও ভাঁড়ার ঘরের সামনে অপেক্ষা  
 করতে দেখলাম। বারীগান আরম্ভ হতে কেন বিলম্ব হচ্ছে ওঁদের কাছে  
 সে সম্পর্কে জানতে চাইলে ওঁরা বললেন—“আপনারা একটু অপেক্ষা  
 করুন। মূলগায়নে একটু পরেই এসে যাবেন। আমরা তো ইতিমধ্যে  
 ওঁদের গানের জন্য আসর পেতে রেখেছি।”

### বারীগান

ওঁদের সঙ্গে আলোচনার কিছুক্ষণ পর আমরা গানের আসরের দিকে  
 এগিয়ে গেলাম। ওখানে পেঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই, মূলগায়নে বাসুদেব  
 চক্রবর্তী তাঁর দলের কয়েকজনকে নিয়ে আসরে এসে পেঁছলেন। মূলগায়নকে  
 দেখে চণ্ডীবাবু তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে এলেন। এরপর মূলগায়নে  
 খোল, করতাল ও হারমোনিয়ম বাদকদের দুটি সারিতে বসিয়ে, মন্দির  
 থেকে সংগৃহীত চামরটি হাতে নিয়ে উত্তর মুখে আসন গ্রহণ করলেন। গান  
 আরম্ভের পূর্বে খোল-করতালের শব্দ শুনতে, ছেলেমেয়েরা খেলা ছেড়ে  
 আসরে গান শুনতে এল। বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীকেও আসরে এসে  
 বসতে দেখলাম।

বারীগানের আশ্রমের আগে মূলগায়নের ও তাঁর দলের লোকেরা শীতলা স্নানঘরের দিকে উত্তর মুখে কোড়েহাতে প্রণাম করে ভক্তিভরে গান ধরলেন। গ্রামবাসীদের অনুরোধে আমরাও তখন আসরে এসে বসলাম। তবে যেহেতু বারীগানের বিশ্ববস্তৃ সম্পর্কে আমাদের কোন পূর্ব-অভিজ্ঞতা নেই, তাই গানের আসরে যিনি আমাদের পাশে বসেছিলেন, তাঁর কাছে এই গানের ধর্মীয় তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন—“গায়নেরা এখন মায়ের স্বপ্ন ভাঙানি গান করছেন। এই গানের তাৎপর্য হল—মাকে স্বপ্ন থেকে জাগিয়ে দেওয়া। কারণ স্বপ্ন থেকে উঠেই তো উনি বন্দনা শুনবেন। আমি আর কতটুকুই বা জানি! আমার নিজের ধারণাটাই আপনাদের বললাম।”

আমাদের কথা বলতে দেখে মূলগায়নকে কিছুটা ইতস্ততঃ করতে দেখলাম। মনে হল, ওঁর একাগ্রতার বাধা পড়ছে। তবে উনি মায়ের স্বপ্ন ভাঙানি গান গাইতে লাগলেন। শেষে, পঞ্চদেবতার বন্দনা শুরুর করলেন। ঐ সময় উনি চামর ব্যজন করছিলেন। উল্লেখ্য যে, মূলগায়ন যখন গান করছিলেন, তখন তাঁর দলের লোকেরা ‘ধূয়া’ ধরছিলেন। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে, গানের দলের প্রত্যেকের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের ফলে, এই প্রভাতী অনুষ্ঠানটি সত্যি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। অনুষ্ঠানের শেষে মূলগায়ন ও তাঁর সঙ্গীরা যখন মায়ের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বাসায় ফিরে গেলেন, আমাদের ঘাড়তে তখন সকাল ৮টা বেজে ৩০ মিনিট।

বারীগানের শেষে গ্রামবাসীদের মুখে শুনলাম, সন্ধ্যা গানের দলের কয়েকজন বিকেলে আবার গান করতে আসবেন। তাই ঐ সময় উপস্থিত থাকবার জন্য ওঁরা আমাদের সাদর আহ্বান জানালেন। কথাপ্রসঙ্গে আজ সকালের নিত্যপূজা সম্পর্কে জানতে চাইলে ওঁরা বললেন—“আর একটু পরেই ঠাকুরমশাই এসে যাবেন। তখন পূজা আরম্ভ হবে। আপনারা তো গতকাল নিত্যপূজার সময় উপস্থিত ছিলেন। বলতে গেলে, সেইভাবেই পূজা হবে। এখনও তো ঠাকুরমশায় এলেন না। স্নাতরাং আপনারা কি অপেক্ষা করবেন?”

ব্রাহ্মণদের আসবার বিলম্ব হচ্ছে দেখে, আমরা জনৈক গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে যেখানে সন্ধ্যা গানের দলের লোকজনেরা আছেন সেখানে গেলাম। ওঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে এসেছি শুনলে, সকলেই খুব খুশী হলেন। শুনলাম, এত সকালে দলের প্রত্যেকের সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, যারা নিকটবর্তী গ্রামের অধিবাসী, তাঁরা সচরাচর আসর শেষ হওয়ার পরে হেঁটে বা সাইকেলে বাড়ি ফিরে যান। তবে, তাঁরা সারাদিন যেখানেই থাকুন না কেন, রাগে গান আশ্রমের পূর্বে অবশ্যই তাঁদের ফিরে আসতে হয়। আমাদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে মূলগায়ন বললেন—“দেখুন, এসব অসুবিধার জন্য ইচ্ছা থাকলেও শ্রোতাদের মনের মত গান শোনানো সম্ভব হয় না। রাত জেগে গানের পর দিনের বেলা একটু

বিভ্রাম না পেলে, সত্যিকার ভাল গান কোনমতেই সম্ভব নয়। অথচ অভাবী শিল্পীদের অনেককেই ভিন্ন বৃত্তিতে নিবৃত্ত থাকতে হয় দিনের বেলা। তাঁদেরই আবার গান গাইতে বা খোল বাজাতে হয় রায়ে। এভাবেই বেশীর ভাগ গানের দল টিকে আছে। এবার আমার নিজের কথা বলি। ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজেরও কোন স্থায়ী দল নেই। নিজস্ব গানের দল না থাকায় কোন গ্রাম থেকে গানের বায়না পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পরিচিত গায়ক-বাদকদের সাধ্যমত পারিশ্রমিক দিয়ে, কোনক্রমে বায়না রক্ষা করতে হয়। এভাবেই আমাকে দল গড়তে হয়েছে।”

এরপর একটু থেমে কিছুটা দুঃখের সঙ্গে বললেন, “আমাদের গান শুনেন আপনারা বা এই দক্ষিণ নারকেলদার গ্রামবাসীরা কতদূর তৃপ্ত হবেন জানি না—কিন্তু আমরা আমাদের সাধ্যমত আপনাদের পাঁচজনকে মায়ের লীলা মাহাত্ম্য শুনিয়ে, আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করব। অবশ্য আপনারা যেভাবে আমাদের গান রেকর্ড করে সবকিছু খুঁটিয়ে জানবার চেষ্টা করছেন—আমার মনে হয় তা যথাযথভাবে করতে গেলে, গানের আসরে বসে গান রেকর্ড না করে দলের অল্প কয়েকজনকে নিয়ে এখানে বসে রেকর্ড করাই ভাল। কারণ, সয়াল গানের আসরে মায়ের মাহাত্ম্য প্রচারের ফাঁকে ফাঁকে, শ্রোতাদের মনোরঞ্জননের জন্য নানারকম হাসকা রসের কথাও বলতে হয়। আমার অভিজ্ঞতা হল—শুধুমাত্র মায়ের গান শুনেন বা শাস্ত্রমতে তার ব্যাখ্যা শুনেন সর্ব শ্রেণীর শ্রোতা তৃপ্ত হয় না। তাই ভাবগম্ভীর আলোচনার পাশাপাশি মজাদার হাস্য-কৌতূকেরও ব্যবস্থা থাকে। এভাবেই আমাদের আসর জমাতে হয়। আজ তো অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিন। অষ্টমঙ্গলার দিন অবধি আমাদের তো এখানে থাকতে হবে। তাই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে আমরা যে সকল গান পরিবেশন করব, প্রয়োজনবোধে আপনারা সেগুণ্ডোর শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা জেনে নিতে পারেন। আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি মত আপনাদের বুদ্ধিয়ে বলবার চেষ্টা করব।”

### মন্দিরে নিত্যপূজা

মূলগায়নের বাসুদেব চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার শেষে, আমরা শীতলা মন্দিরে ফিরে এলাম। ওখানে তখন হিমাংশুবাবু পূজার উপকরণ সাজিয়ে পূর্বমুখে পূজার বসেছেন। হিমাংশুবাবুর কাজে সহায়তা করছেন চণ্ডীবাবু। ব্রাহ্মণ বাড়ির মেয়েরা ভোগঘরে গিয়ে রান্নার আয়োজন করছেন। পূজা আরম্ভের পর থেকে, হিমাংশুবাবুর পূজার ঘণ্টা শুনেন, ঢাকী ঢাক বাজাচ্ছেন। একাট ছেলে তাঁর সঙ্গে কঁাসর বাজিয়ে চলেছে।

নিত্যপূজার কাজে নানাভাবে ব্যস্ত থাকলেও, আমাদের অবগতির প্রয়োজনে চণ্ডীবাবু জানালেন—“নিত্যপূজা ছাড়াও আজ এই মন্দিরে দশবিধ-সংস্কারসহ দেবী শীতলা ও ঘণ্টাকর্ণ দেবের অধিবাস ও বোড়শ-উপচারে পূজাই নয়—অপরপর বেশ কয়েকটি দেব দেবীকেও পণ্ডউপচারে

পূজা করতে হবে। শেষে, মায়ের উদ্দেশ্যে আমিষ ভোগ নিবেদন করতে হবে। তারপর আরতি।”

মন্দিরকক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে পূজা দেখবার সময় চণ্ডীবাবু যে সকল অনুরোধের কথা বলেছিলেন, হিমাংশুবাবু সেগুলি কিভাবে সম্পন্ন করলেন, সে সম্পর্কে আমাদের কিন্তু কোন সঠিক ধারণা করা সম্ভব হল না। তবে এটুকু বুদ্ধিলাম যে, ভোগ নিবেদন ও আরতির শেষে, নিত্যপূজা শেষ হল।

### বিকেলে বারীগান

দুপুরে কিছুটা সময় বিশ্রাম করে, বিকেলের দিকে আমরা মন্দিরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হলাম। সমগ্র মন্দিরপ্রাঙ্গণটি কিন্তু তখনও বেশ নির্জন। মন্দিরের দরজাও বন্ধ। বারীগান শোনবার অপেক্ষায়, আমরা তাই শীতলা মন্দিরের দালানে এসে বসলাম। ওখানে বসবার একটু পরেই, গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন এসে আসরে আসন পেতে রেখে গেলেন। গানের দলের কয়েকজনকে খোল, হারমোনিয়ম নিয়ে আসরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। ওঁরা এসে গানের আসরে গিয়ে বসলেন। প্রাথমিক আয়োজন সম্পূর্ণ হলে, সকালে যেভাবে ওঁরা চামর নিয়ে গান আরম্ভ করেছিলেন, এখনও ঠিক সেভাবেই গান আরম্ভ হল। গান আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও আসরের সামনে আসন গ্রহণ করতে দেখলাম।

গানের আসরে আমাদের দেখে, মূলগায়ন একটি চামর হাতে নিয়ে গান আরম্ভের পূর্বে আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন—“এখন আমরা পঞ্চদেবতার বন্দনা শুরুর করব। এরপর কিছুটা সময় থাকলে, দু-চারটি শ্যামাসঙ্গীত ও ভক্তিমূলক গান গেয়ে শোনাব। এখন মায়ের কাছে এটুকু শোনালেই মা তৃপ্ত হবেন। আমাদের এই বারীগানের উদ্দেশ্য হল, মায়ের করুণা ভিক্ষা করা। সারাবছর তো আর মায়ের ঠিকমত সেবা যত্ন হয় না বা গান শোনানো হয় না। তাই এই পূজার কয়েকদিন মায়ের কাছে গানের ব্যবস্থা করা হয়। এতে মায়ের যেমন আনন্দ হয়, ভক্তিবৃন্দ মায়ের নাম-গান শুনলে তেমনি পুণ্যফল লাভ করেন। আপনারা এই গানকে বলেন বারীগান— আমরা বালি ‘মহড়া দেওয়া’।

এরপর মূলগায়ন শীতলা মন্দিরের দিকে তাকিয়ে করজোড়ে প্রণাম করে, গান আরম্ভ করলেন। খোল, করতাল ও হারমোনিয়ম সহযোগে মূলগায়নের সঙ্গে দোহারগণও সমবেত কণ্ঠ গান করছিলেন। পঞ্চদেবতার বন্দনা শেষ হলে, মূলগায়ন তাঁর হাতের চামরটিকে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর উনি তাঁর কথামত কয়েকটি শ্যামাসঙ্গীত ও ভক্তিমূলক গান গেয়ে বিকেলের আসন শেষ করলেন।

বারীগানের শেষে ওঁরা যখন বাসায় ফিরে যাচ্ছিলেন, সেইসময় মূলগায়ন আমাদের কাছে এগিয়ে এসে বললেন—“মায়ের গান তো শুনলেন,

কেমন লাগল ? গতকাল রাতে যেমন গান হয়েছিল, আজও হবে। অবশ্যই আপনারা আসবেন। আজ রাতে আমি খুব একটা ভাল গান শোনানোর আশা করিনা। তবে আমার দলের লোকেরা সাধ্যমত গাইতে চেষ্টা করবেন। আপনাদের কাছে তো কোন কিছু গোপন করে লাভ নেই। আমার শরীরটা আজ কিছুটা ক্লান্ত। দুপুরে নিরাম, মানে নিরামিষ আহার করেছি। রাতেও নিরাম খেয়ে থাকতে হবে। আমার জন্য যিনি নিরাম রান্না করেছেন, তিনিও আমার স্বগোষ্ঠীর গোড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর স্বাক্ষণ। আর এসব নিয়মনিষ্ঠা মেনে চলবার কারণ হল—আগামীকাল তো মায়ের সঙ্গে আমার বিবাহের দিন ধার্য হয়েছে। অবশ্য তখন আমার পরিচয় মূলগায়ের নয়। আমি তখন ঘণ্টাকর্ণদেব। আপনারা অননুমতি করুন—এবার আমরা চলি। একটু পরেই তো আবার আসতে হবে।”

### সন্ধ্যাবেলায় কর্মব্যস্ততা

বারীগান শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই, পশ্চিম সূর্য ডুবে গেল। মন্দিরের অদূরে ভাঁড়ার ঘরের সামনে গিয়ে দেখলাম—ওখানে বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী নানান আলোচনায় ব্যস্ত। ভাঁড়ারী চণ্ডীচরণ আদক ওঁদের এখনই দূরটো হ্যাজাক জ্বালতে বললেন। একটা দেওয়া হবে শীতলা মন্দিরে এবং অপরটি গানের আসরে। চণ্ডীবাবুর কথামত ওঁদের একজন যখন হ্যাজাক জ্বালতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় খেলাধুলার পরে বাড়ি ফেরবার পথে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আলো জ্বালা দেখতে দাঁড়িয়ে গেল। এর একটু পরে সন্ধ্যার সময় গ্রামের বচ্ছাতিকে মন্দিরের দিকে যেতে দেখে, আমরাও মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। মন্দিরে পেঁছে উনি জল ছড়া দিলেন। তারপর সন্ধ্যাপ্রদীপ জেলে কঁাসর-ঘণ্টা বাজিয়ে, প্রণাম করে বাড়ি ফিরে গেলেন।

উল্লেখ্য যে বচ্ছাতির মাধ্যমে সন্ধ্যা-প্রদীপ দেওয়া হলেও, সয়াল পূজার কয়েকটি দিন মায়ের মন্দিরে যে জাগ-প্রদীপটি থাকে, সেটির দায়িত্ব কিন্তু ভাঁড়ারী চণ্ডীচরণ আদকের। এই কারণে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার কিছু পরে, জাগ প্রদীপ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা চণ্ডীবাবুর কাছে গেলাম। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন—“আপনারা ঠিকই শুনছেন, জাগপ্রদীপটি রক্ষার দায়িত্ব আমারই। সয়াল পূজার প্রাক্কালে এই জাগপ্রদীপটি যেন না নিভে যায়, সেদিকে আমাকে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে রাখতে হয়। যদি কোন কারণে প্রদীপটি নিভে যায়, তবে যে কোনভাবে গ্রামের অমঙ্গল হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। সতরাং আমাকে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। ঐ প্রদীপে নিয়মিত রোড়ির তেল দেওয়া, বাতি ঠিকঠাক করে দেওয়ার কাজও আমার। জাগপ্রদীপটি রক্ষা করতই প্রায় চার কিলোর মত রোড়ির তেল লেগে যায়।”

চণ্ডীবাবু তখন নানা কাজে ব্যস্ত থাকার, আমরা ওখান থেকে শীতলা

মন্দিরে ফিরে গেলাম। মন্দিরের দালানে ওখন কয়েকজন মহিলাকে চোখে পড়ল। পূজক ব্রাহ্মণদের কিন্তু দেখা পেলাম না। তাই ওখানে অপেক্ষারত মহিলাদের কাছে আজ রাতে পূজা আরম্ভের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে, ওঁরাও কিন্তু সঠিকভাবে কিছু বলতে পারলেন না। ওঁদের মধ্যে একজন কেবল এটুকুই ইঙ্গিত দিলেন—“গ্রামের দলের কীর্তন গান আরম্ভ হতে-হতেই, ঠাকুরমশাই মন্দিরে এসে পূজায় বসবেন। তবে কীর্তন আরম্ভ হতে এখনও প্রায় এক ঘণ্টার মত দেরী আছে। আমরা তো কীর্তন শুনতেই এসেছি।”

### কীর্তন

কীর্তন আরম্ভ হতে দেরী হবে শুন্যে, আমরা একটু বিশ্রামের জন্য বাসার ফিরে গেলাম। এরপর প্রায় ঠাণ্ডি ন’টার সময় খোল-করতালের শব্দ শুন্যে, তাড়াতাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে ওখানে গ্রামের দলের লোকেরা কীর্তন গান শুন্যে করেছেন। অপরাপর গ্রামবাসীদের সঙ্গে আমরাও তাই কীর্তন শুনতে বসলাম। দেখলাম, গতকাল ওঁরা যেভাবে কীর্তন পরিবেশন করেছিলেন, আজও ঠিক সেভাবেই গান পরিবেশিত হল।

গানের শেষে ওঁদের কাছে আমাদের প্রশ্ন ছিল—ঠিক কি কারণে আপনাদের দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামে কীর্তন গানের বিস্তার সম্ভব হল? আমাদের এই প্রশ্নের উত্তরে ওঁদের মধ্যে একজন বললেন—“দেখুন, আমরা যতটুকু জানি, বহুদিন আগে থেকেই এই গ্রামের বিশেষ কয়েকটি পরিবার কীর্তন গান ছাড়াও, শ্রীখোল চর্চায় আগ্রহী। আজও তাই সে চর্চাটুকু কোনক্রমে টিকে আছে। অবশ্য যারা এই কীর্তন অথবা শ্রীখোল চর্চা করেন, তাঁদের মধ্যে সকলেই কিন্তু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত নন। যাইহোক, বিশেষ করে আমাদের এই দক্ষিণ নারকেলদা গ্রামের অধিবাসীরা এমনই কীর্তন গানের ভক্ত যে, দেবী শীতলার সয়াল পূজা উপলক্ষেও তাঁরা দেবীর আনন্দের কথা চিন্তা করে, কীর্তনের ব্যবস্থা করেন। শুন্যে তাই নয়, বহিরাগত সয়াল গানের দলের লোকেরা আমন্ত্রিত হলেও, আসরের সূচনায় গ্রামের কীর্তন দলের লোকেরাই কিন্তু মায়ের কাছে গান শোনানোর অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে; আজও সেই ধারা একইভাবে চলে আসছে।

আরও একটা কথা আপনাদের বলি। শুন্যেছি, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা সচরাচর কোন দেবী পূজার অংশগ্রহণে আপত্তি করেন। কিন্তু আমাদের এখানে মায়ের সয়াল পূজায় তাঁরাও সানন্দে যোগদান করেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, গ্রাম-জীবনের সুখ-দুঃখের শরিক হতে গেলে, কোন ব্যক্তির পক্ষেই যথাযথ অর্থে শাক্ত, শৈব অথবা বৈষ্ণব হওয়া সম্ভব নয়। আপদে-বিপদে তাই আমরা নানান দেব দেবীর কাছে মানত করি। পীরসাহেবের দরগাতেও যাই। দেখুন না, দেবীর সয়াল পূজার ক্ষেত্রেও, ধর্মীয় ছুঁতমাগের কোন স্থান নেই। তাই এখানে শীতলা পূজাটি

মুখ্য হলেও, পূজার বিভিন্ন দিনে আমরা হরি বা নারায়ণের পূজা, কৃষ্ণের উপাখ্যাননিষ্ঠার গোষ্ঠপূজা এবং ওলাবিবি পূজার ব্যবস্থা করে থাকি। অনুষ্ঠানের সময় মূলগায়নের দলের লোকেরা গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার অবাস্থিত ঐ সকল দেবস্থানে গান শুনিয়ে থাকেন।”

### মন্দিরে পূজা

কীর্তন দলের লোকজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার শেষে, আমরা শীতলা মন্দিরে ফিরে গেলাম। আমাদের দেখে হিমাংশুবাবু বললেন— “এতক্ষণে এলেন। একটু আগে এলে পূজার উপকরণগুলি সাজানো থেকে আরম্ভ করে, দশবিধ ক্রিয়ার প্রয়োজনে যে সকল আয়োজন সম্পন্ন করতে হয়, তা দেখতে পেতেন। অবশ্য ইতিপূর্বে বোধহয় আপনারা জানিয়ে-ছিলাম যে, পূজার দ্বিতীয় দিন থেকে আরম্ভ করে চতুর্থ দিন পর্যন্ত দশবিধ সংস্কারের অনুষ্ঠানগুলিকে মন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন করতে হয়। প্রত্যেকটি সংস্কার যথোচিতভাবে পালনের প্রয়োজনে, নানাপ্রকার পূজা এবং সেই পূজা পরিচালনার জন্য শাস্ত্রীয় উপকরণও সংগ্রহ করতে হয়। এই সংস্কারগুলি হল—

- (১) গর্ভাধান
- (২) পুংসবন
- (৩) সীমন্তোন্নয়ন
- (৪) জাতকর্ম
- (৫) নামকরণ
- (৬) নিষ্ক্রমণ
- (৭) অন্নপ্রাশন
- (৮) চূড়াকরণ
- (৯) উপনয়ন ও
- (১০) বিবাহ।

জানেন, মন্দিরে পূজার মাধ্যমে এই সংস্কারগুলিকে আমরা কিভাবে পালন করি, সে সম্পর্কে এখনই বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। দূ-চার কথায় বলতে গেলে—দশবিধ সংস্কারের প্রথাগুলি উচ্চবর্ণের মধ্যে মেনে চলাই যেমন শাস্ত্র-সম্মত, ঠিক তেমনি আমাদের এখানে সম্মান পূজার প্রাকালে দেবী শীতলার সঙ্গে ষাটাকর্গ দেবের বিবাহকে কেন্দ্র করে, দশবিধ সংস্কার পালনের অনুষ্ঠানটিও অত্যাবশ্যিক। আশাকারি আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, মন্দিরে যখন এই দশবিধ সংস্কারের কাজ চলে, সেইসময় মূলগায়ন তাঁর গানের মাধ্যমে দেবী শীতলার উপাখ্যানগুলি পরিবেশন করে চলে।”

আমাদের এই কথাবার্তার সময় চণ্ডীবাবু এসে জানালেন যে, একটু আগেই গানের আসরে চামর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই আমরা যদি প্রথম

থেকে শুনতে চাই, তবে এখনই আসরে বাওয়া ভাল। ঐ সঙ্গে হিমাংশুদাব্দ বললেন—“পূজার শেষে যখন আরাতি হবে, তখন সম্ভব হলে মন্দিরে চলে আসবেন। অবশ্য আমার এখানে পূজার কাজ মিটতে মিটতে, আসরে মূলগায়নেও তাঁর অনুষ্ঠান শেষ করবেন।”

### সয়াল গান

এরপর সয়াল গানের আসরে এসে দেখলাম, ইতিমধ্যে মূলগায়নের দলের লোকেরা বৃষ্টি ঠিকঠাক করে সুরে বেঁধে, গ্রাম তরফের অনুষ্ঠিতর জন্য অপেক্ষা করছেন। ইতিপূর্বে মন্দির থেকে আনা চামরটি, একটি কাপড়ের উপর রাখা হয়েছে। একটু পরে মূলগায়নকে গান আরম্ভের হুকুম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তিনি আসর থেকে শীতলা মন্দিরের উদ্দেশে উত্তর মুখে করজোড়ে প্রণাম করে, সেই চামরটি হাতে নিয়ে গান ধরলেন। মূলগায়ন যখন পঞ্চদেবতার বন্দনা গেয়ে শোনাচ্ছিলেন, সেইসময় ওঁর দলের লোকেরা সমবেতভাবে ধূয়া ধরে, সুরের সঙ্গীত রক্ষা করছিলেন। বন্দনা গানের শেষে, দেবী শীতলার সহকারী জ্বরাসুরের পরামর্শে দেবী কিভাবে রোগ-ব্যাদিগণের সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, মূলগায়ন সে সম্পর্কে শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। ঐ সময় জ্বরাসুরের সঙ্গে দেবীর নাটকীয় কথোপকথনের অংশগুলি সত্যই বাস্তব ধর্মী হয়ে ওঠে। তা' ছাড়া, ব্যাদিগণের জন্মপ্রসঙ্গে মূলগায়ন যখন নানা প্রকার বসন্তের বিবরণ পরিবেশন করছিলেন, শ্রোতাদের তখন বেশ অভিভূত মনে হল।

### মালা-চন্দন

গান শেষ হওয়ার কিছুটা পূর্বে, চণ্ডীবাবু মন্দির থেকে মালা-চন্দনের উপকরণ হাতে নিয়ে আসরে উপস্থিত হলেন।

গতকালের মত আজও তিনি প্রথমে মূলগায়নের হাতের চামরে মালা-চন্দন দিয়ে, অপরাপর বাদ্যযন্ত্রগুলিকে মালা-চন্দন দিতে লাগলেন। এরপর মূলগায়ন, মন্ত্রাংশপী ও দোহারদের মালা-চন্দন দেওয়া শেষ করে, শ্রোতাদের মধ্য থেকে কয়েকজন প্রতিনিধিকেও মালা-চন্দনে সম্মানিত করলেন। উল্লেখ্য যে, গানের আসরে বা আসরের বাইরে যারা মালা-চন্দনে ভূষিত হয়েছিলেন—আজও তাঁদের প্রত্যেকেই চণ্ডীবাবুকে প্রণাম করে পদধূলি মাথায় নিলেন। এভাবে, মালা-চন্দন দেওয়ার কাজ শেষ হলে, চণ্ডীবাবু তাড়াতাড়ি মন্দিরে ফিরে গেলেন।

### আসর ফোর

মালা-চন্দনের অব্যবহিত পরে, মূলগায়ন তাঁর চামর নিয়ে শ্রোতাদের কাছে গেলেন। ঐ সময় তাঁর হাতের চামরের স্পর্শলাভের জন্য, প্রত্যেকেই উদ্‌গীব হয়ে উঠেছিলেন। কারণ, মূলগায়নের ভূমিকার আসরে অবতীর্ণ

হলেও, এখন ভিনই তো ছদ্মবেশে—দেবী শীতলা। দেবীর অধিকার মন্দিরে। তাই মূলগায়নেকেই এখন দেবী শীতলার ছদ্মবেশ ধারণ করে দেবীর অলৌকিক ক্ষমতার কথা সবসমক্ষে প্রচার করতে হয়। এভাবেই দেবী শীতলার লীলা মাহাত্ম্য বংশ পরম্পরার গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচারিত হয়। উল্লেখ্য যে, দেবীর প্রতীকে মূলগায়নের হাতে চন্দরের স্পর্শ পেয়ে, অনেকেই তাঁকে ভক্তিরে পা-ছঁয়ে প্রণাম করছিলেন। ঐ সঙ্গে নিজ নিজ সাধ্যমত প্রণামীর খুচরো পরসাত দিচ্ছিলেন। মূলগায়ন যখন ভক্তদের মধ্যে আসর ফেরার কাজে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় তাঁর দলের লোকেরা আসরে বসে গান করছিলেন। আসর ফেরার কাজ শেষ হলে, মূলগায়ন পুনরায় আসরে ফিরে গেলেন। অবশ্য উনি গানে অংশগ্রহণ না করে, উত্তর মুখে আসরে দাঁড়িয়ে দূর থেকে মায়ের উদ্দেশে চামর-বাজন করতে লাগলেন। ঐ সময় দলের লোকেরা মূলগায়নের চামর-বাজনের তালে তালে খোল, করতাল ও হারমোনিয়মের মাধ্যমে এক বিচিত্র ঐকতানের সৃষ্টি করে, সমগ্র আসরটিকে মূগ্ধ করে তুলছিলেন।

### আরতি

উল্লেখ্য যে, চামর-বাজন ও সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত শব্দ হওয়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই, মন্দির থেকে আরতির ঘণ্টা ও ঢাক-কাঁসরের শব্দ শোনা গেল। এর ফলে, বেশীর ভাগ শ্রোতাই গানের আসর ছেড়ে শীতলা মন্দিরের সামনে আরতি দেখবার জন্য চলে গেলেন। ওঁদের অনুসরণ করে আমরাও মন্দিরের দালানে গিয়ে দাঁড়ালাম। মন্দিরে আরতির সময় গ্রামবাসীরা যখন বেশ তন্ময়, সেইসময় মূলগায়ন মন্দিরকক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে চামর-বাজন করছিলেন। এর কিছুক্ষণ পরে আরতি শেষ হলে, ওখানে উপস্থিত সকলেই মন্দিরে প্রণাম করে পূজকের ছড়ানো শাক্তজল মাথায় নিলেন।

আরতি শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গানের আসরে ফিরে গেলাম। ওখানে তখন মূলগায়ন ও তাঁর সঙ্গীরা বাদ্যযন্ত্রগুলিতে গুঁছিয়ে নিয়ে বাসায় ফিরতে ব্যস্ত। আমাদের দেখে সকলেই জানতে চাইলেন—ওঁদের গান আমাদের ভাল লেগেছে কিনা, শ্রোতারা কোন বিরূপ মন্তব্য করেছেন কিনা ইত্যাদি। কথাপ্রসঙ্গে মূলগায়নের কাছে আমরা জানতে চাইলাম—আজ তাঁর গানের মধ্যে চৌষাট্টি প্রকার বসন্তের উল্লেখ থাকলেও, পৃথক পৃথক ভাবে উনি সবগুলির নাম অথবা নির্দিষ্টভাবে কোন জাতিকে দেবী শীতলা কি প্রকারের বসন্ত বিতরণ করেছিলেন—সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এড়িয়ে গেলেন কেন?

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে উনি বললেন—“দেখুন, গুরুর কাছে মানে আমার শিক্ষাগুরুর কাছে যতটুকু পেয়েছি, আসরে ঠিক ততটুকুই আমি শ্রোতাদের কাছে নিবেদন করেছি। তবে আপনারা যেভাবে জানতে চাইছেন, মনে হয় ঠিক সেভাবে আমার শেখা নেই। তাছাড়া, যতদূর মনে

পড়ে—অন্য কোন আসরে এভাবে আমার কাছে কোন শ্রোতা জানতেও চান নি। তবে আপনারা যেটা জানতে চাইছেন, সেই প্রশ্নটা যে আমার চিত্রায় আসে নি, তা নয়। অপরাপর গায়নদের কাছে খোঁজ-খবরও করেছি। কিন্তু হিসেব করে কেউ মেটা মেলাতে পারেন নি। ওঁদের মুখে শুনছি, নিত্যানন্দের লেখা ছাপা বইতে নার্কি চৌষটি প্রকার বসন্তের নাম ও সেইসঙ্গে কোন জাতিকে কি ধরণের বসন্ত দেওয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে পয়ার ছন্দে সবকিছু লেখা আছে। আমার পক্ষে সে বইটি গানে নিত্যানন্দের ‘শীতলা মঙ্গল’—এখনও ভালভাবে দেখা হয়ে ওঠে নি। প্রয়োজনবোধে আপনারা বইটি দেখতে পারেন। এছাড়া লেখক নিত্যানন্দ যেহেতু কাশীজোড়া পরগণায় বসবাস করতেন—তাই ঐ অঞ্চলে খোঁজ-খবর করলে হয়ত কোন প্রাচীন পুঁথির খোঁজও পেতে পারেন। যাইহোক, এখন রাত হয়েছে অনেক। তাই, পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে।”